পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক গুরুট্রেনিং স্কুল ও গুরুট্রেনিং কেন্দ্র এবং শিক্ষয়িত্রী ট্রেনিং স্কুলের জন্য নির্দ্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত সাহায্যকারী পুস্তক।

শিক্ষা-বিজ্ঞান

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার ডেপুটী চীফ ইনস্‌পেক্টর
মিঃ এস. কে. ঘোষ, এম. এ. (ক্যান্টাব.), বি. ই. এস.
মহোদয় বলেন :—

শ্রীমান্ অনিলচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি প্রণীত **শিক্ষা-বিজ্ঞান** পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। বইখানি গুরুট্রেনিং পাঠার্থী ছাত্রদের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া আমি মনে করি।

ইতি—

স্বাক্ষর—**এস. কে. ঘোষ**

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্ত্তৃক যাবতীয় গুরুট্রেনিং স্কুল ও কেন্দ্রের এবং
শিক্ষয়িত্রী ট্রেনিং স্কুলের জন্য নির্দ্দিষ্ট সিলেবাস অনুযায়ী
সাহায্যকারী পুস্তক।

শিক্ষা-বিজ্ঞান

ধান্যকুড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেণী ও মগরাহাট (২৪-পরগণা) গুরু ট্রেনিং
কেন্দ্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ; ছোটদের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া,
আগুনের পরশমণি, শিশুপাঠ্য ব্যাকরণ ও রচনা
প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ, বি.এ., বি.টি.

প্রণীত

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত
তৃতীয় সংস্করণ

মণ্ডল ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড,
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

কলিকাতা এজেন্টস্ :

সরস্বতী বুক ডিপো

২২বি, গৌর মোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

মূল্য—১॥০

সরস্বতী বুক ডিপোর পক্ষে প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র মণ্ডল, ৮১, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও প্যারিস আর্ট প্রেস, ৪এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীকিশোরী মোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

গুরু ছাত্রদের শিক্ষা-বিজ্ঞানের 'নোট' দিবার সময়ে দেখা গেল যে, এ বৎসরের গুরুট্রেনিং সিলেবাস্ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বহু ব্যাপক এবং যে কয়খানি পুস্তক অধুনা প্রচলিত আছে, তাহাদের কোন একখানিতে সম্পূর্ণ সিলেবাস্ অনুযায়ী বিষয়সমূহ সন্নিবিষ্ট নাই। কতকগুলি বিষয় সম্পূর্ণ নূতন। তখন ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিলাম। এক্ষণে ধান্যকুড়িয়া গুরুট্রেনিং কেন্দ্রের গুরু ছাত্রদিগের অনুরোধে এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তক প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের আগ্রহ না থাকিলে ইহা আদৌ প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নে আমি Dr. Nunn কৃত "Education, its data and first principles", Sandiford কৃত "Educational psychology," মাননীয় খানবাহাদুর আবদুর রহমান সাহেব কৃত "শিক্ষা-বিজ্ঞান", বাবু প্রমথনাথ দাশগুপ্ত কৃত "নূতন শিক্ষা-প্রণালী", মাননীয় খান সাহেব আবদুল হাকিম কৃত "আধুনিক শিক্ষক" ইত্যাদি পুস্তক হইতে বহু সাহায্য পাইয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়নে আমার অগ্রজ বারাসতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, বি. এল., ও দ্বিতীয় অগ্রজ শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, বি. এ., বি. টি., ও তৃতীয় অগ্রজ শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ ও চতুর্থ অগ্রজ শ্রীঅমলচন্দ্র ঘোষ উৎসাহ দিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

এই পুস্তক প্রকাশের জন্য কুমুদ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ৺পুলিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় ও মোহাম্মদ আবদুর রসিদ সাহেবের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তাড়াতাড়ির জন্য পুস্তকে বহু ভ্রম থাকিয়া গেল ; আশা করি শিক্ষকমহাশয়গণ ও গুরু-ছাত্রবৃন্দ (যাঁহারা আগামী কল্য শিক্ষক হইবেন) তাহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইবেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। নিবেদন ইতি—

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

যাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতিতে এই অকিঞ্চিৎকর বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইল তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। এবারও বন্ধুবর সুবোধবাবুর চেষ্টা ও যত্নে ইহা সম্ভবপর হইল। পুস্তকের মধ্যে বিষয়সমূহ অনেক বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছে ও কিছু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে সেইজন্য আকারও বাড়িয়া গিয়াছে। কিছু মূল্য বৰ্দ্ধিত করা হইল। আশা করি এই বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিবেন।

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

উৎসর্গ

আমার স্বর্গগত পিতা ৺আশুতোষ ঘোষ ও মাতার উদ্দেশ্যে—

অনিল।

শিক্ষা-বিজ্ঞান

শিশু মনস্তত্ব

শিশুর মন

শিক্ষা-বিজ্ঞান পাঠের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষকমাত্রেরই শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষকতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ না করিলে শিক্ষকতা করিতে যাওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক ব্যবসার জন্য বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর আমরা কি প্রকারে নির্ভর করিতে পারি ?

শিশুদের লইয়াই শিক্ষকতা, অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষকগণের পক্ষে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষকদিগের শিশু-মনস্তত্ব অধ্যয়ন করা দরকার এবং শিক্ষাদান প্রণালী সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা হয়তো শিক্ষাদান কার্য্য কিছু সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভুল-ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

শিক্ষাদান কার্য্য অত্যন্ত জটিল ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার উপর শিশুর, কেবলমাত্র শিশুর কেন সমগ্র জাতির শুভাশুভ, ভবিষ্যৎ, সর্ববিধ উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং

সাহায্য করে। অনেকে কৌতূহলী শিশুর প্রশ্নে বিরক্ত হন এবং ধমক দিয়া তাহার কৌতূহল নিবৃত্তি করেন। তাঁহারা ইহা একবারও চিন্তা করেন না যে, সেই সঙ্গে শিশুর জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহাকে চিরতরে বিনষ্ট করিতেছেন। কৌতূহলী শিশুর প্রশ্নকেই আমাদের শিক্ষা দিবার ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা উচিত।

বুদ্ধি বৃত্তি ও তাহার পরিপোষণ
(Intellect and Its Development)

সহজ প্রবৃত্তি মানব ও ইতর প্রাণী উভয়েরই আছে। ইতর প্রাণীর মধ্যে সহজ-বৃত্তি বেশী, কারণ ইতর প্রাণীর সমুদয় ব্যবহার উহার উপর নির্ভর করে, কিন্তু মানুষের এমন একটি জিনিষ, আছে, যাহা ইতর প্রাণীর নাই—ইহাই বুদ্ধি। বুদ্ধি—ব্যক্তির ভিতরকার (Innate) একটা শক্তি এবং সহজাত।

শিক্ষার প্রভাবে ইতর প্রাণী কোন কোন বুদ্ধির কাজ করিতে পারে—সে বুদ্ধি তাহার নিজস্ব নহে, ইহা অনুকরণ মাত্র।

শিক্ষা—অনুরূপ ক্ষেত্রে অপরস্থানে প্রয়োগ করিবার যে সহজ ক্ষমতা তাহাই বুদ্ধি। এই বুদ্ধির প্রভাবে মানব শ্রেষ্ঠ জীব।

ইতর প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তির ব্যবহার, অন্ধের পথ ভ্রমণের ন্যায়। ঠিক যে অবস্থায় যাহা শিক্ষা করে, ঠিক সেই অবস্থা না হইলে সে সেই শিক্ষা কাজে লাগাইতে পারে না। কিন্তু

মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে সহজ প্রবৃত্তির ব্যবহারে কার্য্য করে। যাহারা চিন্তা করিতে জানে, তাহাদের প্রক্রিয়া ধারণামূলক হয়।

মানুষের স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি সবই বুদ্ধির কার্য্য, শরীরের অঙ্গ বিশেষের অনুশীলনীতে যেমন সমস্ত শরীরের উন্নতি হয় না, কেবল ঐ অঙ্গেরই হয়; সেইরূপ মনের কোন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে সমস্ত মনের উন্নতি সাধন হয় না, কেবল ঐ বিশেষ ক্ষমতার উন্নতি হয়। আবার কোন অঙ্গের একরূপ সঞ্চালনে যেমন ঐ অঙ্গের সর্ব্বপ্রকার সঞ্চালন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না, তদ্রূপ মনের কোন ক্ষমতার একরূপ ব্যবহারে উহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয় না। যেমন:—Mathematicsএ General knowledgeই হইয়া থাকে, কিন্তু Memory বর্দ্ধিত হয় না।

পরিপোষণ (Development)

বুদ্ধির পরিপোষণ করিতে হইলে স্মৃতি, কল্পনা ও যুক্তি ইত্যাদির পরিপোষণ করিতে হইবে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, একস্থলের শিক্ষা অপরস্থলে কেবলমাত্র দুইটি অবস্থায় কার্য্যকরী হয়—

(১) যখন এই দুই স্থলের করণীয় বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিবে। যেমন—ছবি দেখিতে দেখিতে কল্পনাশক্তির উন্নতি হয়, তখন নূতন ছবির বিশ্লেষণ করা সহজ হয়, এইস্থলে বিষয়ের সাদৃশ্য আছে।

পরিলক্ষিত হয়। এই জন্মগত ক্ষমতা ও জ্ঞানের পার্থক্য আছে বলিয়াই বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দুইটি শিশুকে কখনও একই রূপে গড়িয়া তোলা যায় না। বংশ-প্রভাব বলিতে আমরা সাধারণতঃ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সহজাত উপাদানগুলিকে বুঝি।

শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পর যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে "মানুষ" হইতে থাকে তাহাকেই আমরা "পরিবেষ্টন" বলিয়া থাকি। শিশুশিক্ষার পক্ষে এই পরিবেষ্টনের প্রভাব যে যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে মানুষের শিক্ষার পক্ষে তাহার বংশপ্রভাবই প্রবল। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দোষ বা গুণ-গুলি অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আবার আর একদল পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের মতে পরিবেষ্টনীর প্রভাবই মানুষের জীবনে কার্য্যকরী হয়। বংশ-প্রভাব কিছুই নহে, উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর আওতায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বংশ-প্রভাবও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। জন্মের সময় আমাদের ললাটে বিধাতা-পুরুষ দ্বারা অঙ্কিত "ছাপ"ই আমাদের উন্নতির ভিত্তি, ইহাই পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণের ধারণা। কিন্তু শেষোক্ত পণ্ডিতগণ ইহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। যদি তাহাই হয় তবে মূর্খ পিতামাতার সন্তান কোন্ আশায় বিদ্যাশিক্ষা করিবে? রুগ্ন পিতামাতার সন্তান কোন্ আশায় সংসার-পথে যাত্রা করিবে?

প্রথমোক্ত দলের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মতের পরিপোষক

রূপে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে; শিশু তাহার পিতামাতার বিশেষতঃ মাতার চারিত্রিক গুণ বা দোষের প্রভাব হইতে কখনও নিজেকে মুক্ত করিতে পারে না। একবার এক সৈনিক-পুরুষ কোন এক হোটেলওয়ালীর সহিত অবৈধ প্রণয় করে, তাহার ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার সন্তান-সন্ততির মধ্যে সকলেই দুশ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্রা হইয়াছিল। উক্ত সৈনিক-পুরুষের আইনানুসারে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহারা ভদ্র ও শিক্ষিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মানুষের জীবনে তাহার বংশ-প্রভাব অত্যন্ত কার্য্যকরী হয় এবং শিশু সাধারণতঃ তাহার মাতার চারিত্রিক গুণ-দোষের অধিকারী হয়।

শেষোক্ত দল ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর প্রভাবে বংশগত দোষগুণ সংশোধন করা সম্ভবপর। আফ্রিকার কোন এক অসভ্যজাতি ছয় সংখ্যা পর্য্যন্ত গুণিতে পারিত কিন্তু তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা মিশনারীদিগের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য সভ্যজাতির ন্যায় অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে।

শিশু-মনের উপযুক্তরূপ বিকাশ সাধনের পক্ষে বংশ ও পরিবেষ্টনীর মধ্যে কোন্‌টির প্রভাব বেশী তাহা লইয়া বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে। যদি বংশ-প্রভাবকে বাদ দিয়া কেবল-মাত্র পরিবেষ্টনীর প্রভাবকেই প্রাধান্য দিই তাহা হইলে আমরা প্রত্যেক ছাত্রকেই একই পরিবেষ্টনীর দ্বারা—যাহার মধ্যে শিক্ষাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল—উন্নত করিয়া তুলিতে পারি। কিন্তু

ব্যবহারিক জগতে তাহার ব্যতিক্রম বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে প্রদত্ত কোন একটি পাঠ সকল ছাত্র কি একই সময়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে? ইহা দেখা গিয়াছে যে প্রায় একই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন দুইজন মানুষের জীবনের বিকাশ-সাধন বিভিন্ন প্রকারের হয় যদি তাহাদিগকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে রাখা হয়।

এই উভয় প্রভাবের ও ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট ধারণা রাখিয়া শিক্ষকদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানই শিক্ষকের কাজকে সরল করিয়া দিবে।

জন্মের সময়ই বংশগত সমুদয় গুণ শিশুর মধ্যে প্রকট হয় না এবং পিতামাতার বিশেষ গুণও সন্তান লাভ করিতে পারে না। কতকগুলি সাধারণ গুণ বা দোষ শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায়, এবং তাহাও জীবনের বিভিন্ন সোপানে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। সেগুলি একই সময়ে প্রকাশ পায় না।

উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে শিক্ষার সুযোগ যত অধিক হইবে শিশুর উন্নতিও তত অধিক হইবে। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাবে শিশুর বংশগত সদ্‌গুণ পরিস্ফুট হইতে পারে না এবং শিশুর কতকগুলি অপরিস্ফুট গুণও উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে। এই কারণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে বংশ-প্রভাবকেই পণ্ডিতগণ প্রাধান্য দিতেন কিন্তু এক্ষণে পরিবেষ্টনীর প্রভাবই অধিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। একারণ শিশু যে সমস্ত গুণ লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট

হয় সেইগুলির সম্যক বিকাশ-সাধনের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককেই উপযুক্ত "পরিবেষ্টনীর" উপর নির্ভর করিতে হইবে, যাহাতে সেই সকল সহজাত বৃত্তিগুলির উপযুক্ত বিকাশ সাধিত হয়। বংশ-প্রভাব ও পরিবেষ্টনীর প্রভাব উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক।

অনুরাগ (Interest)

শিক্ষার সঙ্গে সুখ বা আনন্দ জড়িত থাকা আবশ্যক। শিক্ষিতব্য বিষয়টি বালকের সম্মুখে এরূপভাবে উপস্থিত করিতে হয় যেন উহাতে তাহার অনুরাগ জন্মে। "অনুরাগ মনের একটি ভাব।" কোন ঘটনা বা বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলে উহাতে সন্তোষ লাভ করিবার জন্য মনের স্বাভাবিক ঝোঁক বা আকর্ষণকে "অনুরাগ" বলে। মন কোন্ কাজ বা কোন্ বস্তু চায় তাহা প্রধানতঃ নির্ভর করে তাহার মনের অনুরাগের উপর। অনুরাগই আকাঙ্খার বিষয় নির্দ্ধারণ করে। অনুরাগ একটি শক্তি যাহা মনের ইচ্ছাকে চালনা করে।

অনুরাগ ব্যতীত কোন বিষয় শিক্ষালাভ করা যায় না।

অনুরাগ দুই প্রকার :—(১) সহজ (Natural), (২) অর্জ্জিত (Acquired), অথবা মুখ্য (Direct) ও গৌণ (Indirect)। স্বভাবতঃ সকল প্রাণীরই কতকগুলি বিষয়ের প্রতি সহজ অনুরাগ থাকে। সেই বিষয়গুলি প্রবৃত্তি-

মূলক আবেগের (Instinctive impulse) সৃষ্টি করে। প্রবৃত্তিমূলক আবেগের গভীরতা অনুরাগের গভীরতার উপর নির্ভর করে।

কোন কোন বিষয়ে বালকের সহজ অনুরাগ থাকে, কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যেমন—গণনা, নামতা, অঙ্ক ইত্যাদি, যাহাতে বালকের সহজ অনুরাগ নাই অথচ উহা শিক্ষা করা দরকার। শেষোক্ত অবস্থায় অর্জ্জিত বা গৌণ অনুরাগ উৎপাদন করা দরকার। বালিকার পুতুল খেলার অনুরাগ আছে, কিন্তু গণনা করিতে চাহে না; তখন তাহাকে তাহার কয়টি পুতুল আছে গণিয়া বলিতে বলিলে সে আনন্দের সহিত গণনা করিবে।

অনুরাগ উৎপাদনের উপায়ঃ—যখন আমরা কোন বিষয়ের প্রয়োজন বা অর্থ লক্ষ্য করিতে পারি তখন সে বিষয়ে আমাদের অনুরাগ জন্মে। শিশুরা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে—দূরদৃষ্টি নাই—কাজেই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে অক্ষম। এই কারণে কোন পাঠে শিশুর অনুরাগ জন্মাইতে হইলে সেই পাঠটি তাহার বয়সের উপযোগী হওয়া দরকার, এবং যাহাতে তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বালক স্বেচ্ছায় চেষ্টা করে সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

প্রথমতঃ—যাহার অর্থ বা প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট, তাহা বালককে শিক্ষা দিতে হইবে, যেমন নিজের নাম, পিতার নাম, গ্রামের নাম অথবা যে সমস্ত জিনিষ সর্ব্বদা ব্যবহার করে। পুরস্কার বিতরণের দ্বারাও নানা বিষয়ের অর্জ্জিত বা গৌণ

অনুরাগ উৎপাদন করা যায়। কেহ কেহ এরূপ প্রলোভন দ্বারা অনুরাগ উৎপাদনের বিরোধী।

অনুরাগ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

কোন বস্তু বা বিষয়ের অনুরাগ জন্মিলে শিশু সেই বস্তু বা বিষয়টি মনোযোগের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও শ্রবণ করে, সুতরাং উক্ত বস্তু বা বিষয়টির ধারণা তাহার মনে সুস্পষ্ট হইলে উহা স্মরণ রাখা সহজ; এইজন্য পাঠে বালকের অনুরাগ উৎপাদন করিতে হইবে। আমরা যখন কোন বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করি তখন শুধু উক্ত বিষয়টি আয়ত্ব করিয়াই আমরা সন্তোষ লাভ করি না। আরও অধিক জানিবার জন্য মনের স্বাভাবিক আকাঙ্খা রহিয়া যায়। ইহার ভিতর আত্ম-প্রচেষ্টা (Self-activity) বর্ত্তমান আছে। অনুরাগ বিপথে ধাবিত হইলে বালকের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হয়। একারণ প্রবৃত্তিমূলক আবেগের গভীরতার প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং সেইমত অনুরাগের সৃষ্টি করিয়া বালকের প্রবৃত্তিমূলক আবেগকে চালিত করিতে হইবে।

মনোযোগ (Attention)

মনোযোগ দ্বারা আমাদের মানসিক শক্তির বৃদ্ধিলাভ ঘটে। স্মরণশক্তির ভিত্তি মনোযোগ। অনুরাগের সাহায্যে মনোযোগ

বৃদ্ধি পায় এবং মনোযোগ বৃদ্ধি পাইলে বস্তু বা বিষয়টির ধারণা অমোদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। যেখানে অনুরাগ সেইখানেই মনোযোগ এবং যেখানে মনোযোগ সেইখানেই অনুরাগ। কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুরাগ না থাকিলে আমরা তাহাতে মনোযোগ দিই না এবং যে বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আছে, বুঝিতে হইবে যে সেই বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে বলিয়াই মনোযোগ দিতেছি। মনোযোগের দ্বারা ধারণা সুস্পষ্ট হয় এবং স্মরণ রাখিবার পক্ষে সুস্পষ্ট ধারণা একান্ত প্রয়োজনীয়।

"যে মানসিক শক্তি মনকে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে কোন একটি বিষয়ে নিবিষ্ট রাখে তাহাকেই মনোযোগ বলা হয়।" (দাশগুপ্ত)

মনোযোগের তিনটি প্রধান ধর্ম্ম

(১) কোন বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে মন স্থাপিত করিবার শক্তি।

(২) কোন একটি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মন নিয়োজিত করার শক্তি বা একাগ্রচিত্ততা।

(৩) একাগ্রচিত্ততা বা তন্ময়তা স্থায়ী করা।

সাধারণতঃ শিশুদিগের মনোযোগ এক বিষয়ে কতক্ষণ স্থায়ী হয় ?

বয়স	কতক্ষণ এক বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী থাকে।
৬ বৎসর	১৫ মিনিট
৮-১০ ,,	২০ ,,
১১-১২ ,,	২৫ ,,
১৩-১৬ ,,	৩০ ,,

এইজন্য পাঠের সময় একই বিষয়ে অধিকক্ষণ শিশুদিগকে ব্যাপৃত রাখা উচিত নহে। তাহাতে শিশুর মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে, ফলে আশানুরূপ শিক্ষালাভ হয় না। একারণ মাঝে মাঝে কিছু সময় মন যাহাতে বিশ্রাম পায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ক্রমাগত বকিয়া যাইলে বালক কিছুই শুনিবে না বা উহাতে মনোযোগ দিবে না।

শিশুর মন অতি শৈশবে চঞ্চল অবস্থায় থাকে। কোন একটি বিষয়ে বা বস্তুতে শিশুর অনুরাগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, শীঘ্র শীঘ্র বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সন্নিবেশিত হয় এবং সহজেই পরিবর্ত্তন করা যায়। এই চাঞ্চল্যের সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই আছে। শিশুর বাঞ্ছনীয় অনুরাগ দ্বারা তাহার অবাঞ্ছনীয় অনুরাগ দূর করা যাইতে পারে। এজন্য বিভিন্ন পাঠের ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের সুযোগ দেওয়া দরকার।

মনোযোগ স্থায়ী করিবার উপায়

(১) বাহ্যিক অসুবিধাগুলি দূর করিতে হইবে। বাহ্যিক বা শারীরিক অসুবিধাগুলি দূর না করিলে মনোযোগ স্থায়ী

হয় না, যেমন গৃহের আলো অতিরিক্ত বা অল্প না হয়, বসিবার পক্ষে অসুবিধা না হয়, ইত্যাদি।

(২) মানসিক অসুবিধা—যে সকল বিষয় বা বস্তু দ্বারা বালকের মন বিক্ষিপ্ত হইতে পারে তাহার দূরীকরণ। বিদ্যালয়ের নিকটে গান-বাজনা ইত্যাদির অসুবিধা দূর করিতে হইবে।

(৩) চিত্তাকর্ষক বস্তুর সাহায্যে অথবা পূর্ব্বপরিচিত পাঠের সহিত নূতন পাঠের সম্বন্ধ দ্বারা বালকের অনুরাগ উৎপাদন করা যাইতে পারে এবং অনুরাগ জন্মিলেই মনোযোগ আপনি আসিয়া পড়িবে।

(৪) বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন প্রণালী দ্বারা পাঠ্যবিষয় উপস্থাপিত করিতে পারিলে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকের স্বরের বৈচিত্র্যও এ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকরী হয়।

(৫) ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কোন এক বিষয়ে মনোযোগ স্থায়ী করা যায়, ইচ্ছাশক্তি অভ্যাস দ্বারা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শিশুদিগের ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় নহে একারণ এই উপায় কার্য্যকরী হয় না। পূর্ব্বোক্ত চারিটি উপায়ই অবলম্বনীয়।

স্মরণশক্তি বা স্মৃতি

"যে মানসিক শক্তিবলে আমরা কোন বিষয়, চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে রক্ষা করিতে পারি এবং প্রয়োজন মত পুনরায় উক্ত বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করিয়া চিনিতে পারি, তাহাকে স্মরণশক্তি বলে।"
(দাশগুপ্ত)

এই স্মরণশক্তি আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির ও নৈতিক অভ্যাস

বা চরিত্রগঠনের সহায়ক। শিক্ষালাভ করিতে হইলে স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন।

কোন্ কোন্ বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন ?

আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যে কার্য্য বা বিষয়ের স্থায়ীভাব আবশ্যক তাহাই আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যাহাই সম্মুখে আসে তাহাই কণ্ঠস্থ করা উচিত নহে। এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহা বর্ণেবর্ণে স্মরণ রাখা উচিত, যেমন "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন হয় না।" যাহা বালকের জীবনে স্থায়ীভাবে আবশ্যক হইবে তাহাই সে স্মরণ রাখিবে, যেমন অক্ষর পরিচয়, ধারাপাতের নামতা, শুভঙ্করের আর্য্যা, ইতিহাসের তারিখ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত, সুন্দর কবিতা, উৎকৃষ্ট ভাষায় লিখিত মনীষীগণের বাক্যাবলি এই নিয়মের অন্তর্গত, এইগুলি স্থায়ীভাবে আনন্দ-বর্দ্ধন করে। পাঠ্য-পুস্তকের গল্প বর্ণেবর্ণে কণ্ঠস্থ করা দোষ। ইহাতে বালক, শব্দের ভুল প্রয়োগ করিবে এবং ভুল অর্থ বুঝিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে।

স্মরণশক্তির প্রয়োজনীয়তা

স্মরণশক্তি ব্যতীত, আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি, চরিত্রগঠন ও শিক্ষালাভ হয় না। এখন যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি পর-মুহূর্ত্তে যদি তাহা ভুলিয়া যাই, তবে আমাদের জ্ঞান কিরূপে বর্দ্ধিত হইবে ? এখন যাহা করিতেছি পরমুহূর্ত্তে যদি তাহা স্মরণ না থাকে তবে কার্য্য করিবার অভ্যাস কিরূপে গঠিত

হইবে? অভ্যাস (Habit is the second nature) গঠন না হইলে চরিত্রগঠন বা শিক্ষাকার্য্য হইতে পারে না। (Character is a bundle of habits.) না বুঝিয়া স্মরণ-শক্তির অনুচিত পরিচালনা অহিতকর। মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রগঠনের জন্য স্মরণশক্তির পরি-চালনা আবশ্যক ও মঙ্গলজনক।

স্মরণশক্তির উন্নতি করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বনীয়? যুবকদের অপেক্ষা ছেলেমেয়েদের স্মরণশক্তি প্রবল। কিন্তু ১২ বৎসর অতিক্রম করিলে জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়। স্মরণ রাখিবার জন্য চক্ষু-কর্ণের ব্যবহার, লিখন ও পুনরাবৃত্তির আবশ্যক। স্মরণ রাখিবার জন্য ক্রমাগত অধিক সময় ব্যয় না করিয়া মাঝে মাঝে বিরাম অধিকতর ফলদায়ক।

স্মরণশক্তি ক্রমবর্দ্ধনের উপায়

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বর্দ্ধন নির্ভর করে—

(১) পৌনঃপুন,—একই বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা বা আবৃত্তি করা। এইরূপে বিষয়টি মনের মধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়।

(২) অনুরাগ,—কোন বিষয়ের প্রতি যত বেশী অনুরাগ সৃষ্টি করিতে পারা যাইবে সেই বিষয় তত বেশী আমাদের স্মৃতিপটে জাগরিত থাকিবে।

(৩) মনোযোগ,—অনুরাগের দ্বারা মনোযোগ আসিবে —গভীর মনোযোগ বিষয়টি স্মরণ রাখার জন্য বিশেষ সাহায্য করিবে।

(৪) আনুসঙ্গিক ভাব,—একটি জিনিষের বা কার্য্যের সহিত অপর একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ বা কার্য্যের সম্বন্ধ মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলে সেই বিষয় তাড়াতাড়ি স্মরণে আসে।

(৫) স্বাস্থ্য,—স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে স্মরণশক্তি ঠিক মত কার্য্য করে না। কারণ, বালকের দৈহিক অসুস্থতা তাহার মনোযোগের অন্তরায় হয় এবং মনোযোগের অভাব হইলেই স্মরণ রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

(৬) ধারণা-শৃঙ্খল বা সংযোগ—বিষয়টির সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই এবং পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কি সে বিষয়ে ধারণা থাকিলে একটি বিষয়ের মাধ্যমে অন্য বিষয়টি সহজেই স্মরণ রাখা যায়।

পাঠ মুখস্থ রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনীয়—

(ক) পাঠটি বেশ মনোযোগের সহিত ২।৩ বার পাঠ করিতে হইবে।

(খ) তৎপর ২।৩ ছত্র মুখস্থ করা।

(গ) উহা মুখস্থ হইলে আরও কিছু বেশী করিয়া আবৃত্তি করা।

(ঘ) এইরূপে একটি সম্পূর্ণ পাঠ মুখস্থ হইলে, না দেখিয়া পাঠটি কয়েকবার আবৃত্তি করিয়া দেখা। উপরোক্ত নিয়ম অবলম্বনে পাঠ মুখস্থ করিতে হইবে।

———

ব্যবহার ও সহজ প্রবৃত্তি
(Behaviour and Instinct)

আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যাহা দ্বারা আমাদের ক্রিয়া-কলাপ একটি সুনির্দ্দিষ্ট ধারায় চলিতে থাকে। জীব-জগতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের আচরণে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ধারা আছে, যাহা শুধু যে জন্তুটির জীবদ্দশা পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে তাহা নহে পুরুষানুক্রমে চলিয়া থাকে। এইগুলিকে আমরা সহজ প্রবৃত্তি (Instinct) বলি। জীবজন্তু অনেক জটিল ক্রিয়া শিক্ষালাভ না করিয়াই শুধু এই সহজ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদন করে। কিন্তু প্রবৃত্তির বাঁধা ধরা গণ্ডীর বাহিরের কোন সমস্যা আসিলে তখন তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে না। সেইজন্য প্রবৃত্তি-মূলক আচরণকে অন্ধ বলা হয়। তাই পশু প্রবৃত্তির দ্বারা ও মানব বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া থাকে।

শিশুর ব্যবহার হইতে আমরা তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারি। এই সকল ব্যবহার শিশুর সহজ প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শিশুর মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। উহা সঙ্গে লইয়াই শিশু জন্মগ্রহণ করে। ঐসকল সহজাত প্রবৃত্তি হইতে যে সমস্ত ব্যবহার প্রকাশ পায় সেইগুলি শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। উহা শিশুর মঙ্গলের জন্য আপনা আপনিই (automatic) হয়।

উহাদ্বারা শিশু বিনা শিক্ষায় নিজেকে রক্ষা করে এবং ঐসকল সহজ-বৃত্তির পরিপোষণের উপর শিশুর ক্রমবৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ নির্ভর করে। অন্ধকার গৃহের মধ্যে বসিয়া থাকা অবস্থায় যদি হঠাৎ উজ্জ্বল আলোক চক্ষের উপর পতিত হয় অমনি চক্ষের পলক পড়ে। এস্থলে শরীরের উক্ত অংশ রক্ষার জন্য উহাতে গতির উৎপত্তি হয়, ইহা আপনা আপনি হয়। ইহা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। আবার কতকস্থলে সমগ্র শরীরের মঙ্গলের জন্য গতির উৎপত্তি হয়, যেমন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ; প্রাণ রক্ষার জন্য লুকান বা দৌড়ান। শরীরের কোন অংশ রক্ষা করিবার জন্য যে গতির উৎপত্তি হয় উহা অনৈচ্ছিক, উহাকেই পরাবর্ত্তক প্রতিক্রিয়া (Reflex movement) বলে। আর সমগ্র শরীরের রক্ষার জন্য যে গতির উৎপত্তি হয়, তাহাকে সহজ প্রতিক্রিয়া (Instinctive movement) বলে। কিন্তু ইহা দেখা যায় যে সমগ্র শরীর রক্ষার জন্য যে গতি তাহা কতকগুলি পরাবর্ত্তক প্রতিক্রিয়ার সমাবেশ মাত্র। শরীরের বিভিন্ন অংশের মঙ্গলের জন্য অনৈচ্ছিক পরাবর্ত্তক প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং উহাদের সমষ্টি দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হয়। প্রত্যেক সহজ প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার সহিত কোন না কোন মানসিক আবেগ বর্ত্তমান আছে। যেমন পলায়নের সহিত ভয়, ক্রন্দনের সহিত দুঃখ ইত্যাদি। তবে সকল সময়েই যে আবেগ ও প্রবৃত্তি অবিচ্ছিন্নভাবে থাকে তাহা নহে। প্রাণীর আচরণে

প্রবৃত্তির ক্রিয়া কতকটা নির্দ্দিষ্ট ধরণের হয়। যেমন পক্ষীদের নীড়-নির্ম্মাণকার্য্য পুরুষানুক্রমে একইভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহা তাহারা শিক্ষা করে না। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তিসমূহ পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে, যেমন পর্য্যটন ও আবিষ্কারের মূলে আছে ভ্রমণের ইচ্ছা ও কৌতূহল।

সহজ প্রবৃত্তির কার্য্যকারিতা শরীরের পূর্ণতা ও উহার সাময়িক অবস্থা এবং বয়সের উপর নির্ভর করে। যেমন, যাহার দৌড়াইবার মতন শরীরের পূর্ণতা বা বয়স হইয়াছে সে ভয় পাইলে দৌড়াইয়া পলায়ন করিবে আর যাহার শরীরের সেই অবস্থা আসে নাই সে শরীর সঙ্কুচিত করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শিশুর মঙ্গলের জন্যই সহজ প্রবৃত্তিগুলির অস্তিত্ব। উপকারিতার পাত্রভেদে সহজ প্রবৃত্তিগুলি আমরা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকি :— (১) আত্মগত ; (২) সন্ততিগত ; (৩) সমাজগত। আত্মগত প্রবৃত্তিগুলি প্রধানতঃ আত্মরক্ষার্থে এবং নিজেকে সংসারের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন খাদ্য গ্রহণ, বিপদের সময় পলায়ন প্রভৃতি আত্মরক্ষার জন্য ; এবং অনুকরণ প্রবৃত্তি, কৌতূহল প্রবৃত্তি দ্বারা শিশু ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়। সন্ততিগত প্রবৃত্তি প্রধানতঃ সন্তান-উৎপাদন ও প্রতিপালন সম্বন্ধীয়। সমাজগত প্রবৃত্তি সন্তান রক্ষণেরই অনুরূপ এবং উহার সম্প্রসারণ মাত্র। সমাজে বাস করিতে হইলেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহাতে পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও

অবলম্বিত হয়, কেননা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন মানুষই বাঁচিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভব ও ইচ্ছাবৃত্তি যাহাই আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি না কেন, সমস্ত বৃত্তির মূলেই আছে সহজ-বৃত্তি। এই সহজ-বৃত্তির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয় না—ইহা অন্ধের ন্যায় অজ্ঞাতসারে কার্য্য করে।

সহজ প্রবৃত্তিগুলি শিশুর জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি যদি ঠিক সময়ে উপযুক্ত উত্তেজনার সাহায্যে কাজে লাগান যায়, তাহা হইলে শিশুর শিক্ষা সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। শিশু বিদ্যালয়ে আসিলে প্রথমেই শিক্ষকের কর্ত্তব্য হইবে—শিশুর সহজ প্রবৃত্তিগুলির সন্ধান লওয়া। উহাদের কখন কোন্‌টি বিকাশ লাভ করে এবং উহাদিগকে কি উপায়ে চালিত করিলে উপযুক্ত ফল লাভ করা যায়, ইহা প্রত্যেক শিক্ষকের জানা আবশ্যক। শিশুর সহজ প্রবৃত্তিগুলি যদি উপযুক্ত পরিচালকের হস্তে সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে উঁহাদ্বারা আমাদের শিক্ষাকার্য্য সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠে। অনেক সময় শিশু সহজভাবে কোন মন্দ প্রবৃত্তিমূলক কাজ অনুসরণ করিতে থাকে তখন তাহাতে সোজাসুজি বাধা দিতে যাওয়া অনিষ্টকর। সেই সময় আবশ্যকবোধে উদ্গতি দ্বারা (Sublimation) তাহার প্রবৃত্তিজাত উদ্দাম ক্রিয়া-কলাপের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই আদিম ও পশুধর্মী প্রবৃত্তি লুক্কায়িত আছে—তাহাকে সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণময় পথে নিয়োজিত করার নামই উদ্গতি।

———

ইঙ্গিত বা অভিভাবন (Suggestion)

শিশুরা সাধারণতঃ অনুকরণপ্রিয়। জীবন সাফল্যমণ্ডিত করিতে ও চরিত্র গঠনের পক্ষে অনুকরণ অত্যাবশ্যক। কিন্তু অনুকরণ যদি শুধুমাত্র চিন্তাহীন অনুকরণে পর্য্যবসিত হয়, তবে সেরূপ অনুকরণ দ্বারা অনুকরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ভালমন্দ না দেখিয়া যাহা দেখিল, তাহাই অনুকরণ করিল, ইহা যেন না হয়। এ বিষয়ে শিক্ষককে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে।

অনুকরণের তিনটি বিভিন্ন আকার আছে—(১) আবেগ বা ভাবের অনুকরণ (Sympathy); (২) চিন্তার অনুকরণ, ইহাকেই আমরা ইঙ্গিত বা অভিভাবন (Suggestion) বলি এবং (৩) কার্য্যের অনুকরণ (Imitation), সাধারণতঃ ইহাই অনুকরণ নামে ব্যবহৃত হয়।

যখন অন্যের কথায় বা অন্যের প্রভাবে কেহ বিনা বিচারে কিছু বিশ্বাস করে, এবং তদনুসারে কার্য্য করে সেই সময় সেই ব্যক্তির (যে কার্য্য করে) মনের যে অবস্থা হয়, তাহাকেই আমরা ইঙ্গিত বা অভিভাবন বলি। যে ব্যক্তি ইঙ্গিত অনুযায়ী কার্য্য করিবে, তাহার মনে এই ভাবের উদয় হইবে যে, সেই কার্য্যটি তাহার নিজস্ব, সেই কার্য্য করিতে সে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে না। বশ্যতা অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবই তাহার মনে অধিক জাগরিত হয়। যেমন—ব্রতচারীর নিয়ম অনুযায়ী যখন কেহ পানা বা জঙ্গল পরিষ্কার করে, তখন

তাহা নিজের কাজ মনে করিয়াই করে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিতে এইরূপ করিতেছে, ইহা তাহার একবারও মনে হয় না। আমাদের সকলেরই ভিতর বিশ্বাস-প্রবণতা বর্ত্তমান। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের ইঙ্গিত আমরা বিশ্বাস করি। এইরূপ ইঙ্গিতকে প্রতিপত্তির ইঙ্গিত বলা যাইতে পারে।

শিক্ষকের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিবার মত বয়স যতক্ষণ শিশুদিগের না হয়, ততক্ষণ তাহাদের যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় প্রায়ই তাহার বিপরীত বিষয়ে বিশ্বাস করে, কাজেই তদনুসারে কার্য্য করে। যেমন, কোন শিশুকে যদি কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করা হয়, তাহা হইলে তাহার সেই কার্য্য করিতেই অধিক আগ্রহ বা ঝোঁক প্রকাশ পায়। এই কারণে শিশুদিগকে বিপরীত ইঙ্গিত করিতে হইবে। কিন্তু কোন বিষয়ে সোজাসুজি বিপরীত ইঙ্গিত করিতে যাওয়াও উচিত নহে। কারণ কোন বিষয়ের বিপরীত শিশুদিগের নিকট এত প্রিয় হয় যে, অনেক সময় তাহারা তাহাই করিয়া বসে। শিক্ষককে খুব সাবধানতার সহিত ইঙ্গিত প্রদান করিতে হইবে। "কর্ত্তব্য" শীর্ষক রচনা লিখিতে না দিয়া যদি কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ মনীষীর জীবনী আলোচনা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে বালকগণ কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়াই কর্ত্তব্য শীর্ষক রচনাতেই প্রবৃত্ত হইবে। অনেকে ঠিক বিপরীত ইঙ্গিত প্রদানের পক্ষপাতী; কারণ মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অনুসারে শিশু বিপরীত কার্য্য করিবে। কিন্তু এই বিপরীত কার্য্য শিশুদিগের নিকট অনেক

সময় প্রিয় হয় এবং তাহারা তাহাই করিয়া বসে। একারণ বিপরীত ইঙ্গিত করিতে যাওয়া সকল সময় উচিত নহে।

কতকগুলি বিষয়ে ইঙ্গিতের উপকারিতা থাকিলেও কোন কোন বিষয়ে, যেমন—অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতিতে, ইঙ্গিত করা অনুচিত। বালক যাহাতে নিজে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়, শিক্ষকমহাশয়কে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উত্তর ইঙ্গিত করিবার পরে প্রশ্ন করা উচিত নহে।

অনুকরণ (Imitation)

অন্যের কার্য্য নকল করাকেই অনুকরণ বলে। শিশুরা অপরের কার্য্য অনুকরণ করিতে ভালবাসে। এইজন্য শিশুদের উত্তম পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাখা উচিত, কারণ একবার একটি কার্য্য অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিলে সেই শিক্ষা শিশুর মন হইতে দূর করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

ইতর প্রাণীর মধ্যে অনুকরণ-বৃত্তি অধিক পরিমাণে দেখা যায় এবং তাহাদিগকে প্রধানতঃ অনুকরণ-বৃত্তির উপরেই নির্ভর করিতে হয়। কারণ জীবনধারণ ও রক্ষণ কার্য্যে ইতর প্রাণী তাহার নিজ জাতীয় অপর প্রাণীর নিকট হইতে অনুকরণ দ্বারা শিক্ষা লাভ করে।

শিশুগণ প্রধানতঃ অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করে। বয়সের বৃদ্ধির সহিত স্বেচ্ছাকৃত অনুকরণ দ্বারা তাহারা নানা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং নিজেদের জীবনে তাহা কার্য্যকরী করিতে সচেষ্ট হয়।

অনুকরণ দ্বারা আমরা কার্য্যে নিপুণতা লাভ করি। শিশুরা সকল সময়ই শিক্ষকের হাবভাব, কথা বলার ভঙ্গি, হাতের লেখা প্রভৃতির অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। এইজন্য শিক্ষককে সকল সময়ের জন্য সাবধান হইতে হইবে এবং যাহাতে তিনি আদর্শরূপে ছাত্রদিগের দ্বারা গ্রহণীয় হইতে পারেন, সে বিষয়ে সকল সময়েই সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

শিশুদিগের অনুকরণ-বৃত্তিকে ঠিক পথে চালিত করিতে পারিলে শিক্ষকের কার্য্য অনেক সহজ হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ইহা সকল সময়েই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ছাত্রগণ যেন যাহা কিছু দেখে, তাহাই অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত না হয়। উচ্চ আদর্শ স্থাপিত করিতে হইবে। যেন শিক্ষক নিজেকে আদর্শ-রূপে ব্যবহার করিতে পারেন; কারণ শিক্ষকের কার্য্যাবলী অনুকরণ করা ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয় কার্য্য।

অনেকে অনুকরণ-বৃত্তির ব্যবহার পছন্দ করেন না। কিন্তু জগতে সকল কাজই যদি নিজে হইতে করিতে হইত, তাহা হইলে জগতের উন্নতি কতটুকু সম্ভব হইত? যদি প্রত্যেকেই পূর্ব্ব পুরুষদিগের দ্বারা প্রমাণিত কার্য্যাবলী গ্রহণ না করিয়া নিজে নিজে প্রত্যেক বিষয়ের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে আদিম যুগের অবস্থা হইতে

সভ্যতা একপদও অগ্রসর হইত না। কিন্তু ইহা সকল সময়ই মনে রাখিতে হইবে যে, যেন ছাত্রগণ চিন্তাশূন্য অসার অনুকরণেই তৃপ্ত না হয়। অনুকরণ দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষদিগের সঞ্চিত জ্ঞানের অধিকারী হইবার পর যেন তাহারা নিজেরা সে বিষয়ে উন্নতি করিতে সচেষ্ট হয়।

বিদ্যালয়ের ভিতর অনুকরণ-বৃত্তির অনুশীলনা দ্বারা বিশেষ ফল লাভ করা যায়। মেধাবী ছাত্রের অনুকরণ করিয়া দুর্ব্বল ছাত্রেরা নিজেদের উন্নতি সাধন করিতে পারে। কিন্তু অনুকরণ যেন কোন ক্রমেই "চিন্তাশূন্য" অনুকরণে পর্য্যবসিত না হয়।

—–—

ক্রীড়া-প্রবৃত্তি

ক্রীড়া-প্রবৃত্তি কি? প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি সহজ বৃত্তি। ইহার ভিতর নানাবিধ প্রবৃত্তির সমাবেশ। ইহাতে কৌতূহল আছে; পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কি ঘটে, তাহা দেখিতে শিশু সব সময় উৎসুক হয়। ইহাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে। ইহার দ্বারা নিজের কার্য্যক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় এবং অপরের সহিত প্রতিযোগিতার ভাব আসে। ইহাতে ক্রিয়াশীলতা আছে, ইহাতে অনুকরণ আছে। অপরকে যাহা করিতে দেখে, শিশুগণ স্বভাবতঃ ক্রীড়াচ্ছলে তাহাই করিতে চেষ্টিত হয়। তিন মাস বয়স হইতে যৌবনের উন্মেষ পর্য্যন্ত ইহা প্রধানতঃ কার্য্যকরী থাকে। প্রথমতঃ ইহা অবাধ থাকে।

দ্বিতীয়তঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খেলার ভিতরে উদ্দেশ্যের উদ্রেক হয় এবং উহা বিবিধ নিয়মাধীন হয়। খেলা হইতে ছেলেদের কার্য্যে প্রবৃত্তি আসে। ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য এই প্রকৃতিটির পূর্ণ সুবিধা প্রদান করা উচিত। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাকে অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক মনে করা হয় না। (রহমান)

খেলা স্বাভাবিক, উহা আপনা হইতেই আসে, শিক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু কার্য্যে চিন্তা ও বুদ্ধির প্রয়োজন। কার্য্যের মধ্যে আমরা ফলের প্রত্যাশা করি। কিন্তু খেলার মধ্যে সেরূপ কোন ফলের আশা করি না। কেহ কেহ বলেন যে, খেলার মধ্য দিয়া আমরা ভবিষ্যৎ জীবনে সঙ্কটময় মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হই অর্থাৎ বালক-বালিকাদিগের খেলার মধ্যে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যকলাপ প্রকাশিত হয়। যেমন, মেয়েদের পুতুলখেলা। মেয়েটি পুতুলগুলিকে কাপড় পরাইতেছে, খাওয়াইতেছে, আদর করিতেছে। ইহা দ্বারা সেই মেয়েটি তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্ব পুরুষগণের কার্য্যকলাপের প্রভাব আমাদের জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয়। আমরা খেলার ছলে কার্য্য করি, তাহার ফলে মন্দ প্রবৃত্তিগুলি বিনষ্ট হয়। আমরা ক্রীড়ার ছলে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হই।

ক্রীড়ার সাধারণ গুণ

ক্রীড়ার মধ্যে ছেলেদের মনোযোগ আপনা হইতেই আসে। খেলার ভিতর দিয়া আত্মপ্রচেষ্টা, আত্মনির্ভরতা,

কার্য্যকারিতা প্রভৃতি গুণ ছেলেদের ভিতর আনয়ন করা যায়। প্রত্যেক নরনারীকে ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে, নচেৎ জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইতে হইবে। ক্রীড়ার ভিতর দিয়া ছেলেদের আত্মনির্ভরতার শক্তি ও সুযোগের সন্ধান দিতে হইবে। বহির্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠতা, সামাজিক রীতিনীতির ব্যবহার এবং নূতন নূতন জিনিষ আবিষ্কার করিবার শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে।

আমরা কি কি ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন করিতে পারি? Scouting (ব্রতী বালক), Girl Guide, ক্রীকেট, ফুটবল, হকি প্রভৃতি ব্যয়সাপেক্ষ, সেগুলির স্থলে কপাটি, ডিগ্-ডিগ্, হা-ডু-ডু প্রভৃতির প্রবর্ত্তন দেশোপযোগী।

কৌতূহল (Curiosity)

শিশুর জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইহা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কোন না কোন আকারে কার্য্য করিয়া থাকে। কৌতূহল—জ্ঞানপিপাসা। ইহার প্রভাবে শিশু যাহা কিছু দেখে বা শুনে, তদ্বিষয়ে জানিতে উৎসুক হয়। ইহা শিশুকে পরিবেষ্টনের সহিত পরিচিত ও উপযোগী করিয়া তুলে। কৌতূহল, ভবিষ্যতে যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে মানুষকে প্রস্তুত করিয়া রাখে।

কৌতূহল-প্রবৃত্তি কার্য্যে একাগ্রতা উৎপাদন করে এবং তৎসঙ্গে কার্য্যের প্রতি প্রসন্নভাবের উদয় হয়, এই একাগ্রতাকে মনোযোগ ও প্রসন্নভাবকে আসক্তি বলে। নূতনত্ব কৌতূহলের প্রধান উদ্দীপক। কোন বস্তু বার বার দেখিতে দেখিতে উহার নূতনত্ব ঘুচিয়া যায়, পূর্ব্বের ন্যায় কৌতূহল থাকে না—কিন্তু উহাতে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতে নূতন কৌতূহলের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সুতরাং "পরিবেষ্টনের পরিবর্ত্তন বা প্রসার ও অপরিচিত বস্তু সম্বন্ধে নূতন তথ্যের আবিষ্কার" এই প্রকারে কৌতূহল বৃদ্ধি পায়।

কৌতূহল শিক্ষার প্রধান উপকরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার যথাসাধ্য ব্যবহার করিতে হইবে। নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া বা পরিচিত বিষয় নূতন দিক হইতে আলোচনা করিয়া কৌতূহল উৎপাদন করা যাইতে পারে। শিশুকে প্রশ্ন করিতে দিতে হইবে। তাহার প্রশ্ন অনুযায়ী তাহাকে নূতন জ্ঞান দিতে হইবে। কৌতূহলই শিশুর মনে মনোযোগ ও আসক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু নূতন জিনিষের আবিষ্কার করিবার জন্য শিশুকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে প্রকৃত আসক্তি আসিবে। নূতন জ্ঞানলাভের জন্য কৌতূহল বিশেষ দরকার, কৌতূহল-প্রবৃত্তি না থাকিলে শিক্ষাকার্য্য অচল অবস্থায় পরিণত হয়। যে শিশুর মধ্যে জানিবার জন্য স্বাভাবিক আগ্রহ নাই, তাহাকে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? এই যে জানিবার আগ্রহ, ইহাই শিশুকে নূতন নূতন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে

(২) যখন এই দুই স্থলের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য থাকিবে। যেমন—সাহিত্য বিশ্লেষণ করিতে করিতে, বিশ্লেষণ পদ্ধতির পুনঃপুনঃ প্রয়োগে বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়—তখন ওকালতি ব্যবসায়ে সেই ক্ষমতা কার্য্যকরী হয়। কেননা বিষয় বিভিন্ন হইলেও পদ্ধতি একই প্রকার।

বুদ্ধিপরিমাপক পরীক্ষা
(Intelligence Test)

আলফ্রেড্ বিনে (Alfred Binet) ১৮৯৫ খৃঃ প্রথম এই বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। কোন শিশু তাহার সমবয়সী অন্য শিশুদের মতন বুদ্ধি সম্পন্ন নহে কেন—ইহাই ছিল্ তাঁহার গবেষণার বিষয়। মানসিক দুর্ব্বলতা অথবা পড়াশুনায় অসুবিধা, যেমন—ঘন ঘন স্কুল পরিবর্ত্তন—ইহার মধ্যে কোন্‌টি ইহার কারণ, তাহাই তিনি গবেষণা করিতে লাগিলেন। বিনে ইহা ধরিয়া লইলেন যে, প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কিছু না কিছু ক্ষমতার বীজ অথবা বুদ্ধিমত্তা বর্ত্তমান আছে,—যাহার দ্বারা কোন প্রকার শিক্ষা লাভ না করিয়াও জীবনের বিভিন্ন স্তরে সে অবাধে বিচরণ করিতে পারে। প্রত্যেক শিশুর জীবনে এমন এক সময় আসে, যখন কোন প্রকার শিক্ষালাভ ব্যতীত সে ভালমন্দ বিচার করিতে পারে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন বয়সের বহু শিশুকে পরীক্ষা করিবার পর নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বিত

হয়, যাহাদ্বারা শিশুর শারীরিক বয়সের তুলনায় মানসিক বয়স ঠিক করিতে পারা যায়। যেমন—যদি কোন দশ বৎসরের বালক দশ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার বয়স অনুযায়ী বুদ্ধিবৃত্তি আছে কিন্তু সেই বালক যদি অষ্টম বর্ষীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষার পর আর যাইতে সক্ষম না হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার বয়স অনুযায়ী বুদ্ধি কত বৎসরের কম। এক্ষণে দেখা যাউক, বয়স অপেক্ষা বুদ্ধি কত বৎসর পর্য্যন্ত কম হইলে সেই শিশুকে তাহার সমবয়সীদের সহিত পড়ান চলিবে না, অথবা তাহাকে বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইবে। বিনে এ বিষয়ে সাধারণতঃ আট বৎসরের উপরস্থ বয়সের জন্য তিন বৎসর এবং আট বৎসরের নিম্ন বয়সের জন্য দুই বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় তাহারা সমবয়সীদের সহিত শিক্ষালাভ করিবার উপযুক্ত নহে।

এক্ষণে কেবলমাত্র মানসিক দুর্ব্বলতা ধরিবার জন্যই এই পরীক্ষা ব্যবহৃত হয় না। ইহার দ্বারা মানুষের সর্ব্ববিধ পারদর্শিতা খুঁজিয়া বাহির করা হয়। এইরূপ স্থানে শিক্ষার সুযোগ কমই থাকে, যেমন—রামের বামে সুলতান এবং মহম্মদ সুলতানের বামে রহিয়াছে, তাহা হইলে মধ্যস্থলে কে রহিয়াছে? আমার মা তোমার মাসী হইলে—তোমার মা আমার মায়ের কে হইবেন?

এইরূপে দেখা যায় যে, এই জাতীয় প্রশ্নের যে সমস্ত শিশু উত্তর দিতে পারে, তাহারা এই ধরণের বুদ্ধির পরিচয় অন্যত্রও দিয়া থাকে।

বহু সংখ্যক লোক একসঙ্গে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে 'Group Test' সম্পাদিত হয়। অন্য এক প্রকারে শিশুদের 'মানসিক বয়স' বাহির করা হইয়া থাকে। কোন শিশু যদি দশ বৎসর বয়সের হয়, কিন্তু সাত বৎসরের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তখন তাহার মানসিক বয়স হইবে ৭/১০ অথবা শতকরা ৭০। অথবা যদি তাহার বুদ্ধি ১৩ বৎসরের ন্যায় হয়, তখন তাহার মানসিক বয়স হইবে ১৩/১০ অথবা শতকরা ১৩০। Dr. Burt বলেন যে, যে সমস্ত শিশুর ৮৫—১৩৫ মানসিক বয়স আছে, তাহারা স্কুল পরিত্যাগ করিবার পর বুদ্ধির কাজ করিতে পারিবে। কিন্তু যে সব ছাত্রের মানসিক বয়স ৭০—৮৫, তাহারা নির্বোধ ও পিছনে-পড়া শ্রেণীর অন্তর্গত। মানসিক বয়স ১১৫—১৩০—ইহারা টেক্‌নিক্যাল প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি করিতে পারে। ১৩০—১৫০—ইহারা মাধ্যমিক স্কুলের বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং ১৫০-এর ঊর্দ্ধে যাহারা, তাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্ররূপে পরিগণিত হয়। ৫০-এর নিম্নে যাহারা, তাহাদের দ্বারা শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত কোন বুদ্ধি-মত্তার কাজ হয় না।

যুক্তি (Reasoning)

এক বা ততোধিক পদ বা বিচার বাক্য হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে যুক্তি বলে। যুক্তি দ্বারা আমরা বিচার্য্য বিষয়

সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করি ; এবং দুই প্রকার প্রণালী দ্বারা আমরা যুক্তিতে উপনীত হই—(১) আরোহী প্রণালীর যুক্তি ও (২) অবরোহী প্রণালীর যুক্তি।

আরোহী প্রণালীর যুক্তি ঃ—অনেকগুলি পৃথক পরিজ্ঞাত বিশেষ বিচার বাক্যের সাহায্যে একটি অপরিজ্ঞাত সাধারণ সূত্রে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে আরোহী প্রণালী বলে। এই প্রণালী দ্বারা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত এক সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। যেমন—রাম মরিয়াছে, শ্যাম মরিয়াছে, রহিম মরিয়াছে,— অতএব সকল মানুষই মরিবে। এক্ষণে রাম, শ্যাম ও রহিমের মৃত্যু আমি দেখিয়াছি, কিন্তু সকই মানুষের মৃত্যু দেখা সম্ভবপর নহে, তথাপি আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, "সকল মানুষই মরিবে।"

অবরোহী প্রণালীর যুক্তি ঃ—যে প্রণালীর সাহায্যে একটি সাধারণ তথ্য কোন একটি বিশেষ ঘটনার উপর প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ঘটনাটি সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত প্রমাণ কর যায়, তাহাকে অবরোহী প্রণালী বলে।

সাধারণ তথ্য—সকল মানুষ মরিবে।

বিশেষ ঘটনা—যদুও মানুষ।

সাধারণ তথ্যের অন্তর্গত বিশেষ ঘটনা—অতএব যদু মরিবে।

যুক্তি দ্বারা আমরা সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই।

"কল্পনা" (Imagination)

প্রতিরূপ উৎপাদনের মানসিক শক্তিকে কল্পনা বলে। বস্তুর অনুপস্থিতিতে কল্পনা হয়। কল্পনা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—

(১) পুনরুৎপাদিনী বা স্মরণশক্তি।

(২) উদ্ভাবনী শক্তি।

পুনরুৎপাদিনী শক্তি :—

আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পরিচিত আকারে ও ধারানুসারে যে প্রতিরূপ উৎপাদন হয়, তাহাকে পুনরুৎপাদিনী শক্তি বলে।

উদ্ভাবনী শক্তি :—

আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পদার্থের যে সমুদয় গুণ পর্য্যবেক্ষণ করি, পদার্থের অনুপস্থিতিতে যে মানসিক শক্তি দ্বারা সেই গুণগুলি নূতন প্রকারে সংযোগ করিয়া নূতন কোন বস্তু বা ঘটনা, ছবি বা প্রতিরূপ অঙ্কিত করিতে সমর্থ হই, সেই মানসিক শক্তিকে আমরা "উদ্ভাবনী শক্তি" বলিয়া থাকি।

উদ্ভাবনী কল্পনার দুইটি শাখা, যথা :—(১) ব্যাখ্যাকারী, (২) সৃষ্টিকারী।

ব্যাখ্যাকারী :—

অপরের বর্ণনা শুনিয়া বা পাঠ করিয়া যে কল্পনা হয়, তাহাকে "ব্যাখ্যাকারী কল্পনা" বলে। যেমন কোন কবির লেখা সমুদ্রের

বর্ণনা পাঠ করিয়া নিজে সমুদ্রের বিষয়ে কল্পনা করিতে পারা যায়।

স্বষ্টিকারী ঃ—

অপরের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া যে কল্পনা হয়, তাহাকে "স্বষ্টিকারী কল্পনা" বলে। যেমন পরী কেহ দেখে নাই বা আকৃতি বিষয়েও কেহ কিছু বর্ণনা করে নাই। সে অবস্থায় কল্পনার সাহায্যে হয়তো দেহটি একটি পরীর তৈয়ারী করিয়া নিজের পরিচিত কোন লাবণ্যময়ী নারীর মুখ অঙ্কিত করিয়া দিলাম। ইহাই স্বষ্টিকারী কল্পনা।

কল্পনার প্রয়োজনীয়তা

কল্পনার অনুশীলনী দ্বারা আমাদের দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়; যথা ঃ—জ্ঞানার্জ্জন ও সৌন্দর্য্য উপভোগ জনিত আনন্দ। অসংযত কল্পনা বুদ্ধির অনিষ্ট ঘটায়। অন্যান্য শক্তির ন্যায় কল্পনাও কুপথে চালিত হইলে বালককে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। যেমন—আকাশ-কুসুম কল্পনা। ইহা দ্বারা বালকের মন অসম্ভব অবাস্তব বিষয়ে লিপ্ত হয়। ডনকুইকসট্ উপন্যাসে এই অবাস্তব কল্পনার দুঃখময় ফল চিত্রিত হইয়াছে।

বয়সভেদে শিশুদিগের মানসিক বুদ্ধি

প্রথম—শৈশবাবস্থা, দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকে। এই সময় শিশুর ভাষাশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং

এই সময় শিশুরা অপরের মনের ভাব জানিবার জন্য উৎসুক হয় ; এই সময় শিশুরা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে।

দ্বিতীয়—প্রথম বাল্যাবস্থা, ২—৭ বৎসর। এই সময় শিশু খেলাধূলায় বেশী মনোযোগী হয় এবং এই খেলাধূলার মধ্য দিয়া তাহার শক্তির অতিরিক্তটুকু ব্যয় করে (Surplus energy); যেমন ইঞ্জিনের ষ্টীম বেশী হইয়া যাইলে তাহা বাহির করিয়া দিতে হয়, না দিলে ক্ষতি সাধিত হইতে পারে; সেইরূপ খেলাধূলার মধ্য দিয়া অতিরিক্ত শক্তি ব্যয়িত হয়। এই সময় অনুসন্ধিৎসুস্পৃহা শিশুর ভিতর প্রকট হইয়া উঠে এবং সমস্ত বিষয়েই প্রশ্ন করিতে থাকে এই সকল প্রশ্নের ভিতর যে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় থাকে, তাহা নহে, বাহ্য-বস্তুর উদ্দীপনাতে শিশু প্রশ্ন করে। শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ৬।৭ বৎসরের মধ্যে খুব দ্রুত সংঘটিত হয়।

তৃতীয়—মধ্যম বাল্যাবস্থা, ৭—১০ বৎসর, এই বয়সে দেহের দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে এবং মস্তিষ্কেরও বৃদ্ধি হয়। এই সময় বস্তুর ব্যবহারের প্রতি শিশুর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং এই সময়ের কর্ম্মের মধ্যে উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকে ও ফলের আকাঙ্খা থাকে। এই সময় শিশুর মধ্যে অনুকরণস্পৃহা জাগরিত হয় এবং অপরের কার্য্য অনুকরণপূর্ব্বক নিপুণতা লাভ করিতে যত্নবান্ হয়। এলোমেলোভাবে দ্রব্যের ব্যবহার না করিয়া বেশ শৃঙ্খলতার সহিত দ্রব্যের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে এবং তাহার চিন্তাশক্তি জন্মে। এই সময় স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্নতা বৃদ্ধি পায় এবং মুখস্থ করিবার প্রতি ঝোঁক আসে। এক্ষণে তুলনা-মূলক বিচার-শক্তির ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় এবং প্রত্যেক

কর্ম্মেই অনুরাগ লক্ষিত হয়। প্রতিযোগীতামূলক কার্য্যে বালক আনন্দ অনুভব করে এবং প্রত্যেক কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হয়; কেবলমাত্র ঝোঁকের মাথায় কার্য্য করিয়া যায় না। এই সময়ে বিনা বিচারে কিছু মানিয়া লইতে বালক রাজি হয় না এবং তাহার চিন্তাশক্তি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে।

চতুর্থ—শেষ বাল্যাবস্থা, ১৩—১৪ বৎসর। এই বয়সে সংগ্রহ ও গঠন প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ হয়। এতদিন পর্য্যন্ত বালক নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসিত—নিজের ভাল-মন্দের প্রতিই যত্নবান্ হইত, কিন্তু এক্ষণে সে দল গঠন করিতে এবং দলের হইয়া কার্য্য করিতে উৎসুক হয়। এইরূপে অপরের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহার দ্বারা অপরের নৈতিক শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী হয়। কারণ, এই মেলা-মেশার ভিতর দিয়া যেমন ভাল ফল ফলিতে পারে, সেইরূপ বালকের অনিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে।

অস্বাভাবিক শিশু (Abnormal Child)

বিশৃঙ্খল প্রকৃতির শিশু প্রায়ই কার্য্যে বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া থাকে। এই সকল শিশুর মধ্যে প্রতিভা আছে, তাহা না হইলে নূতন নূতন অন্যায় কার্য্য করিবার মত বুদ্ধি তাহাদের কোথা হইতে আসে? ইহারা নিত্য-নূতন দুষ্টামি করিয়া

থাকে। এই উদ্ভাবনী শক্তির ঠিক মত পরিচালনা হইলে শিশুকালে ইহারা মেধাবী ছাত্রে পরিণত হইতে পারে। এই সকল শিশুর প্রতি অযথা কঠোর ব্যবহার করিলে তাহার ফল খারাপ হইতে পারে। শিশু কেন এরূপ দুষ্টামি করে, প্রথমে তাহার সন্ধান লইতে হইবে; তৎপরে সেই কারণ দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অযথা কঠোর ব্যবহার দ্বারা শিশুর দুষ্টামি করিবার প্রবৃত্তি বর্দ্ধিতই হইবে। এই সকল শিশুর প্রতি সদয় ব্যবহার দ্বারা তাহাদের চিত্ত জয় করিতে হইবে, তাহা বলিয়া শিক্ষক যেন তাঁহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ না করেন। শিক্ষককে দৃঢ় হইতে হইবে এবং প্রয়োজন মত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু এই শাস্তি যেন অযথা কঠোর না হয়।

দুর্ব্বল বা পিছাইয়া-পড়া শিশু (Backward Child)

শ্রেণীর মধ্যে সকল শিশুই সমান বুদ্ধিসম্পন্ন হয় না। কেহ কেহ খুব শীঘ্রই জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে সক্ষম হয়, আবার কেহ কেহ বিলম্বে তাহা আয়ত্ত করে। এই সকল পিছাইয়া-পড়া শিশুর যে যে বিষয়ে দুর্ব্বলতা আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎপরে সেই সকল দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য শিক্ষককে চেষ্টিত হইতে হইবে। এই সকল শিশুকে আলাদা করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। এই স্থলেই শ্রেণীগত পঠন অপেক্ষা একক পঠনের প্রয়োজনীয়তা অধিক কার্য্যকরী হয়। এই একক পঠন- (individual treatment) কালে সেই শিশুর দুর্ব্বলতাগুলি দূরীভূত করিতে সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হইতে হইবে। এরূপ করা

যখানে সম্ভবপর নহে, সে স্থলে সেই সকল দুর্ব্বল শিশুকে অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের পার্শ্বে বসিতে দিয়া যাহাতে সেই সকল মেধাবী ছাত্রের সহায্য লাভ করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক দুর্ব্বল শিশুকে পৃথক-ভাবে সাহায্য করাই অপেক্ষাকৃত উত্তম উপায়।

উপরোক্ত প্রকৃতির শিশুদের মধ্যে বালক ও বালিকাদিগের প্রতি একইরূপ ব্যবহার করা উচিত নহে। বালকগণ সাধারণতঃ প্রভুত্ব করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, বাধা-বিপত্তির প্রতি তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না ও স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে। ইহাদিগকে চালিত করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু মেয়েরা সাধারণতঃ স্বল্পভাষী ও অভিমানী হয়। ইহারা সহজেই মনের মধ্যে আঘাত পায় এবং চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে আত্ম-প্রকাশের আনন্দ জন্মাইয়া দিতে পারিলে ফল ভাল হইবে। মোটের উপর, শিক্ষককে প্রত্যেক বালক ও বালিকার মনের অবস্থা জানিয়া তৎপরে তাহার প্রতি ব্যবহার করিতে হইবে। এই মনের অবস্থার উপর শিক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শিশু কি চায়, কেন চায়, ইহা জানিতে না পারিলে শিক্ষাদান কার্য্য সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

ডেঁপো বা অকালপক্ক শিশু (Precocious child)—এই সকল শিশু বেশ চট্‌পটে হয় এবং ইঙ্গিত মাত্রেই তাহাতে সাড়া দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ইতস্ততঃ ভাব দেখা যায় না। ইহারা এতবেশী চট্‌পটে যে ইহাদের উত্তর মাঝে মাঝে বয়সের

শক্তির বাহিরে বলিয়া মনে হয়। ইহারা আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে বলিয়া ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সহজ। কিন্তু ইহাদের বিচারশক্তি খুবই কম; এই কারণে ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অযথা ডেঁপোমি বলিয়া ইহাদিগকে দাবাইয়া রাখা উচিত নহে। বয়সের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমত্তা ইহাদের মধ্যে বর্ত্তমান, এই বুদ্ধিমত্তাকে উপযুক্তরূপে চালিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

দুরন্ত প্রকৃতির শিশু (Troublesome child)—এই প্রকৃতির শিশুরা সকল সময়েই শিক্ষকদের অসুবিধা ঘটাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা সত্য যে, এই সকল শিশু সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্। অসুবিধা ঘটাইবার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন এবং এই সকল দুরন্ত প্রকৃতির শিশুর মস্তিষ্ক উর্ব্বর। নিত্য-নূতন দুষ্টামির ফলে ইহাদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচালনা প্রচুর পরিমাণে হয়। ইহারা প্রায়ই সংযত হয় না। এই সকল শিশুদের যদি সংযত করিয়া তাহাদের বুদ্ধিমত্তাকে ঠিক পথে চালিত করা যায়, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করা যাইতে পারে। যখনই মনের কোন প্রকারের ইচ্ছা প্রকাশের উপযুক্ত পথ না পায়, তখনই তাহারা দুষ্টামির আশ্রয় লয়। এইজন্য সেই সকল শিশুর মনের অবস্থা জানা দরকার এবং তৎপরে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। তাহা না হইলে এই সকল শিশুর দুষ্টামি আরও

বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। দৃঢ় অথচ সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষকই এই প্রকৃতির শিশুদের পক্ষে উপযুক্ত।

অবসাদ ও তাহা দূরীকরণের উপায়

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলে অবসাদ আসে। এই অবসাদ তিন প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে :—

প্রথমতঃ—মাংসপেশীসমূহের অধিক পরিচালন দ্বারা। কোন ভারি দ্রব্য অনবরত বহন করিলে মাংসপেশীসমূহ কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে এবং Toxin নামক এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ও অবসাদ আসে।

দ্বিতীয়তঃ—মস্তিষ্কের অত্যধিক পরিচালন দ্বারা। বহুক্ষণ-ব্যাপি পড়াশুনার ফলে ইহা ঘটিয়া থাকে। ইহাও Toxin দ্বারা হয়।

তৃতীয়তঃ—ইন্দ্রিয়জনিত (Sensory)। যেমন কোন অন্ধকার গৃহে বসিয়া যদি বহুক্ষণ সিনেমার ছবি দেখা যায়, তবে চক্ষুর অবসাদ আসে।

শরীরের মধ্যে যখন অম্লজান বায়ুর বিরলতা সংঘটিত হয়, তখন শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে।

কি উপায়ে অবসাদ দূর করা যায়? নিদ্রাই হইতেছে অবসাদ দূর করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। নিদ্রার দ্বারা আমরা বিশ্রাম উপভোগ করি এবং সেই সময় শরীরে অম্লজান বায়ুর আবির্ভাব হয়, কাজেই অবসাদ দূর হয়; নূতন শক্তির সঞ্চার হয় এবং কর্ম্মে প্রেরণা আসে। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ, বিশেষতঃ চিনি এবং অন্যবিধ মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিলে অবসাদ দূর হয়।

'চা', 'কফি' প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য দ্বারাও অবসাদ দূর হইতে পারে। কিন্তু যেখানে মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়, যেমন স্কুলের কার্য্য দ্বারা, সেই অবস্থায় একটি কার্য্যের পরিবর্ত্তে অন্য একটি কার্য্য দেওয়া উচিত। অধিক আয়াসসাধ্য কার্য্য হইতে অল্প আয়াসসাধ্য ও অধিক আনন্দদায়ক কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত, যেমন সমস্ত দিন অফিসে কাজ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেও তৎপরে টেনিস্ খেলিতে কোন কষ্টবোধ হয় না। বিরক্তি অবসাদের পূর্ব্বলক্ষণ। কোন কার্য্যে বিরক্তি আসিলেই সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য—কিন্তু তখনও কাজ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকে বলিয়া অধিক আনন্দ-দায়ক ও অল্প শ্রমশীল অপর কাজ দেওয়া উচিত। ছেলেরা পরিশ্রান্ত হইলে অমনোযোগী হইয়া পড়ে। পরিশ্রান্ত হইলেও তখন পর্য্যন্ত তাহারা অবসাদগ্রস্ত হয় না। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে কার্য্য হইতে একেবারে অব্যাহতি দেওয়া উচিত নহে। বরঞ্চ তাহাদিগকে অধিক আনন্দদায়ক কার্য্যের মধ্য দিয়া উৎসাহিত করিতে হইবে, কারণ তখন তাহাদের মধ্যে কাজ করিবার শক্তি বর্ত্তমান থাকে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনী ও অস্বাস্থ্যকর দৈহিক অবস্থান দ্বারাও অবসাদ আসিতে পারে। যেমন নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দুর্গন্ধ আসা অথবা বসিবার অসুবিধা এইগুলি দূর করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই শিক্ষকমহাশয়কে যত্নবান্ হইতে হইবে।

চরিত্র ও অভ্যাস গঠন
(Formation of Character and Habits)

শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্র গঠন করা। অতএব চরিত্র কাহাকে বলে, তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। চরিত্র দ্বারা আমরা সাধারণতঃ শক্তি বুঝি। যাহার সাহস, জেদ, পরিশ্রম, অধ্যবসায় আছে, তাহাকেই আমরা চরিত্রবান্ বলি। কিন্তু এই সকল শক্তি কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে; উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইবে—এই সমস্ত সদ্‌গুণ বালকের মধ্যে অভ্যাস দ্বারা নিয়মিত করিতে হইবে এবং এই সকল অভ্যাস দ্বারা চরিত্র গঠিত হইবে।

শুধুমাত্র উপরোক্ত শক্তিসকল থাকিলেই তাহাকে চরিত্রবান্ বলা যায় না—এই সকল শক্তির অপব্যবহার করা চলিবে না। অতএব প্রত্যেক চরিত্রবান্ ব্যক্তিকেই বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হইবে। বিচার-বুদ্ধির সম্যক ও নিয়মিত পরিচালন একান্ত প্রয়োজনীয়। অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তি কখনও চরিত্রবান্ হইতে পারে না।

শক্তি ও বিচার-বুদ্ধি থাকিলেই চরিত্রবান্ হওয়া যায় না। কর্ত্তব্যের আহ্বানে সেই শক্তি বিচারানুযায়ী প্রয়োগ করিতে হইবে। কর্ত্তব্য স্থির হওয়া মাত্র চরিত্রবান্ ব্যক্তি তাহাতে সাড়া (Response) দিবেন।

অভ্যাস গঠন

শিশুদিগের অভ্যাস আপনা আপনি গঠিত হয়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, প্রত্যেক মানবের কিছু না কিছু অভ্যাস গঠিত হইবেই। অভ্যাস দ্বারা আমরা নিপুণতা লাভ করি। কোন বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহা দ্বারা সেই কার্য্য অতি দ্রুত ও অল্প শক্তি ব্যয় দ্বারা করা সম্ভবপর হয়। নিপুণতা লাভ করিতে হইলে অভ্যাস গঠন করিতেই হইবে। যেমন সাইকেল চড়িবার সময় প্রথমে আমাদিগকে প্রভূত শ্রম করিতে হয়, আছাড় খাইয়া তারপর শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু চড়া অভ্যস্ত হইয়া গেলে তখন আর কোন কষ্টই অনুভূত হয় না—অত্যন্ত সহজ কার্য্যে পরিণত হয়।

শিশুকালে যাহাতে অভ্যাসগুলি কদভ্যাসে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। কারণ, একবার কদভ্যাস জন্মিলে তাহা আজীবন স্থায়ী হয় এবং তাহা দ্বারা নানা প্রকার কুফল ফলিতে থাকে। এইজন্য যাহাতে শিশু-জীবন হইতেই সদভ্যাস সকল জন্মিতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ, এই সকল অভ্যাসের উপর ভিত্তি করিয়াই শিশু পরবর্ত্তী জীবনে নিষ্কলঙ্ক ও প্রতিভাযুক্ত চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হইবে।

অভ্যাস কিরূপে গঠিত হয়?—আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ি। কোন একটা সঙ্কল্প লইয়া আমরা অভ্যাস গঠন করি না। কিন্তু শিক্ষককে প্রথম হইতেই শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে

তাহার সদভ্যাস সকল গঠিত হয়। ইহা করিতে হইলে শিশুকে পুনঃপুনঃ সেই কার্য্যটি করিতে উৎসাহিত করিতে হইবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ একই কার্য্য করিবার জন্য শিশুর মধ্যে উদ্দীপনা থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দীপনা পুরস্কারের আকারে হইতে পারে। কোন একটি কার্য্য পুনঃপুনঃ করিতে করিতে অভ্যস্ত হইবে অর্থাৎ অভ্যাসটি দৃঢ় হইবে। এইজন্য **পুনঃপুনঃ অনুশীলন** করিতে হইবে। শিশুদিগকে যে বিষয়ে অভ্যাস গঠন করাইতে হইবে—যেমন ধরা যাউক, যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা—সেই অবস্থায় শিক্ষককে নিজে সাবধান হইতে হইবে— যেন তিনি নিজে সেরূপ কার্য্য না করেন। শুধু মুখে উপদেশ দিলেই চলিবে না। অভ্যাস গঠনের জন্য অনুকূল অবস্থার উৎপাদন করিতে হইবে। যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অভ্যাস গঠনের সময় শিক্ষককে সর্ব্বদা শিশু-দিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাগজ, বই, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সরবরাহ করিতে হইবে—এ বিষয়ে অভিভাবকগণের দায়িত্ব অধিক।

অভ্যাস গঠিত হইলে মানসিক শ্রম অল্প হইবে। ধারণা-সমূহও অভ্যাসে পরিণত করিতে হইবে। সাধারণতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধেই ব্যস্ত থাকে—এই ধারণাগুলিই মনের অভ্যাস। শিশুদিগকে জীবনের নানাদিক দেখাইয়া দিয়া তাহাদের চিন্তাধারাগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইবার ক্ষমতা জন্মাইয়া দিতে হইবে--তাহা না হইলে তাহাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে।

কাজ করিবার ও চিন্তার অভ্যাস ব্যতীতও ভাবের অভ্যাস গঠন করিতে হইবে। ইহাই রস (Sentiment) নামে পরিচিত। যদি কোন ধারণা পুনঃপুনঃ আমাদের নানাবিধ ভাবের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন সেই ভাবগুলি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ আবেগে (An organised group of emotions) পরিণত হয়। ভালবাসা ও ঘৃণা—এই দুইটি আদর্শ রস। ইহার প্রত্যেকটি বিভিন্ন আবেগের সংমিশ্রণে গঠিত। একটি আবেগ বিভিন্ন রসেও মিশ্রিত থাকিতে পারে। যেমন ভালবাসার ভিতর ভয়, বিস্ময়, বশ্যতা ইত্যাদি রহিয়াছে।

চরিত্র গঠনের জন্য এই আবেগ আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী। এইজন্য তাহার গঠিত রসের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই রস ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া থাকে।

অভ্যাস গঠনের জন্য নিম্নোক্ত প্রণালী অবলম্বনীয় :—

(১) একটি একটি করিয়া কাজের অভ্যাস শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) কাজ করিবার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে এবং তাহা শিক্ষককে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(৩) নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে।

(৪) ভয় দেখাইয়া অভ্যাস গঠন করা চলিবে না। সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

(৫) করণীয় অভ্যাসটি বালক ভুল করিলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। ভয় বা শারীরিক দণ্ড দিলে ফল বিপরীত হইবে।

(৬) শিষ্টাচারপূর্ণ আদেশ দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইতে হইবে। শিশুর সম্মুখে উন্নত আদর্শ স্থাপন করিলে শিশু অধিক আগ্রহান্বিত হইবে।

(৭) সহজ-বৃত্তির অনুশীলনী দ্বারা সদভ্যাস গঠিত হইতে পারে।

(৮) পুনঃপুনঃ কাজ করিবার অভ্যাস দৃঢ় করিতে হইবে।

(৯) নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে শিশুর অনুরাগ উৎপাদন করিতে হইবে। সহজ-বৃত্তির পরিচালন দ্বারা ইহা সম্ভবপর।

চরিত্র (Character)

যে শিক্ষার দ্বারা চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠিতে না পারে তাহা শিক্ষা নামে অভিহিত হইতে পারে না। চরিত্রই সমাজের প্রতি ব্যক্তির ব্যবহার নির্দ্দেশ করে। চরিত্র হইতেছে অভ্যাস দ্বারা গঠিত মনের এমন একটি অবস্থা যাহা ব্যক্তির কর্ম্মের, ভাবের ও ইচ্ছার পথ নির্দ্দেশ করে।

চরিত্র হইতেছে সুসংবদ্ধ অর্জ্জিত স্বভাবের সমষ্টি যাহা স্থায়ী ও ব্যবহারের নির্দ্দেশক।

অভ্যাস ও রসের সংমিশ্রণের উপর চরিত্র গঠন করিতে হইবে।

———

দ্বিতীয় অংশ

শিক্ষার অর্থ, উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোচনা

কি রাজনৈতিক, কি আর্থিক, কি সামাজিক—সকল প্রকার উন্নতির মূলে আছে শিক্ষা। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। জগতে এমন কোন জাতি নাই, যে জাতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। মানুষের অধঃপতনের মূলে আছে শিক্ষার অভাব।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষা কোন না কোন রূপ ধারণ করিয়া আমাদের জীবন প্রভাবান্বিত করে। জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক—যে প্রকারেরই প্রভাব হউক—যাহাই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাই শিক্ষা নামে অভিহিত হয়।

শিক্ষা-বিজ্ঞানে শিক্ষা এরূপ ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয় না। কোন এক নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য শিশুর জীবনে কার্য্যকরী করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহাই শিক্ষা নামে অভিহিত হয়। উদ্দেশ্যবিহীন অজ্ঞাতসারে কার্য্যকরী প্রভাবকে শিক্ষা নামে অভিহিত করা হয় না। শিশুর নৈতিক, দৈহিক ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য যে সকল বিধি-নিয়মের

ব্যবস্থা করা হয়, তাহাই শিক্ষা নামে অভিহিত। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতকরণও শিক্ষার অন্তর্গত। এই সকল বিধি-নিয়মের মূলে একটি সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? সকল দেশের, সকল সমাজের, সকল সময়ের লোকেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে একমত। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক জাতির, যে যুগের যে আদর্শ তাহারই অভিব্যক্তি। কেহ কেহ বলেন যে, চরিত্র গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য, কেহ কেহ বলেন যে, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত-করণই শিক্ষার উদ্দেশ্য, আবার কাহারও কাহারও মতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল সংজ্ঞার ভিতর কোন একটিই সম্পূর্ণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। রামের নিকট যাহা উত্তম চরিত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে রহিমের নিকট তাহা গৃহীত না হইতেও পারে। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার যে প্রণালী, তাহাতেও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে উপযুক্ত প্রণালী আপনার নিকট গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট তাহা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনও এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে জীবন-যাপন প্রণালী উন্নত, মহৎ ও সুন্দর করিয়া

তুলিতে হইবে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ বলিতে আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় জীবনই বুঝিব। ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতা আসিবে শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি বিধান দ্বারা, এবং যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, সমাজকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের ধারণা করা অসম্ভব, সেইজন্য সমাজের নিয়মগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা অসম্ভব। সমাজের গণ্ডির মধ্যে যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে, যাহা দ্বারা সমাজ বন্ধনের শৃঙ্খলাকে চূর্ণ না করিয়াও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা যায়। সমাজকে অস্বীকার করা চলিবে না—আবার নিজের ব্যক্তিত্বও বলি দেওয়া চলিবে না। ব্যক্তিগত ও সমাজগত এই উভয় জীবনকে উন্নত, সুন্দর ও মহত্ত্বপূর্ণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্যক্তিত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি? প্রত্যেক নর-নারীকে তাহার নিজস্ব গন্তব্য পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। নিজের নিজত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে। অপরের জীবনকে আদর্শ করা চলিতে পারে, কিন্তু নিজেকে সেই আদর্শের নিকট বিলাইয়া দেওয়া চলিবে না। যেমন অপরের লেখা কোন কবিতা দেখাইয়া যদি আমি বলি যে, ঠিক ঐ কবিতাই আমি লিখিব, ঠিক করিয়াছিলাম, তাহা যেমনি হাস্যকর, তেমনি অপরের আদর্শকে দেখাইয়া যদি বলি, উহাই আমার আদর্শ—উহাই আমি অনুকরণ করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহাও তেমনি হাস্যকর। যেমন প্রত্যেক

কবিতার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আছে, তেমনি প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। সেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। অবশ্য সামাজিক গণ্ডিকে অতিক্রম করা চলিবে না।

ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবন উন্নত ও মহত্ত্ব-পূর্ণ করিতে হইলে আমাদিগকে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে ও তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে। "যাহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের অবস্থা, গুণ, ক্রিয়া, পরস্পর সম্বন্ধ ইত্যাদি অবগত হইতে পারি, তাহাই জ্ঞান।" জ্ঞানের অন্ত নাই—ইহা অসীম অনন্ত। অনন্ত জ্ঞান লাভ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নহে। যুগ যুগ ধরিয়া মনীষিগণ জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন—আমরা কতটুকু শিক্ষা করিতে পারি। যেটুকু জ্ঞান লাভ করিব, তাহারই ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে—কারণ জ্ঞান কার্য্যে প্রযুক্ত না হইলে তাহার কোন মূল্যই থাকে না। কিন্তু সকলে সকল কার্য্য করিতে পারে না। অবশ্য করণীয় কার্য্যগুলিই সম্পন্ন করা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল হইলেই আমাদের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। মহৎ জীবন যাপন করিতে হইলেই সাধুতা, সত্যবাদিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণগুলি অর্জ্জন করা উচিত এবং এই সমস্ত গুণই

চরিত্রের উপাদান। ব্যাপক অর্থে যে চরিত্র বুঝায়, তাঁহার গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে মতানৈক্য ছিল, কিন্তু কখনই কেহ 'চরিত্র গঠন'কে বাদ দিয়া শিক্ষার স্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। অতি প্রাচীনকালে গ্রীক্‌গণ জ্ঞানলাভই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ বলিয়া মনে করিতেন ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। স্পার্টানগণ শারীরিক উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। মধ্যযুগে ইউরোপে যখন ধর্ম্মযাজকগণের প্রাধান্য স্থাপিত হইল, তখন ধর্ম্ম শিক্ষাই হইল শিক্ষার উদ্দেশ্য। পরে পার্থিবতার উপর ঝোঁক হইবার সঙ্গে সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইল। এখন সামাজিক জীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবন সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে অতিবাহিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং সমাজের মধ্যে থাকিয়াই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনই মানবের কাম্য।

শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ

ছাত্র

ছাত্রই বিদ্যালয়ের প্রাণ। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের সমাবেশে বিদ্যালয় গঠিত হয়। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—এই সকল ছাত্রকে ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে

প্রস্তুত করা—জাতির উন্নতি সমস্তই ছাত্রদের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষার এই প্রয়োজনীয় অঙ্গের প্রতি এযাবৎ দারুণ অবহেলা করা হইয়াছে। এতদিন এই সকল ছাত্রকে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে গঠিত করা হইত। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তাহাদের সহিত ব্যবহার করা হইত। তাহাদিগকে ক্ষুদ্র আকারে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত এবং সেইভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। শিশুদিগেরও যে নিজস্ব চিন্তার ধারা—কার্য্য প্রণালী বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহা একবারও চিন্তা করা হইত না।

পূর্ব্বে শিক্ষকগণই শ্রেণীর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিতেন। তাঁহারাই শ্রেণীর পূর্ব্বভাগে অবস্থান করিতেন এবং ছাত্রগণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। শিক্ষকগণের ইঙ্গিতে ছাত্রগণ পরিচালিত হইত—তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বকে আদৌ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হইত না। ছাত্রগণই যে সব, বিদ্যালয় বলিতে যে ছাত্রদিগকেই বুঝায়, তাহা ভুলিয়া যাইয়া শিক্ষকগণের প্রাধান্য সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া উঠিত।

ফরাসী দেশের 'রুশো' নামক লেখকই প্রথমে এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনী চালনা করেন। তাঁহার মতে—ছাত্রগণই সর্ব্বস্ব—ছাত্রদিগকে পিছনে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্রেণীর মধ্যে তাহাদিগকে প্রাধান্য দিতে হইবে। শিক্ষক পশ্চাতে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দ্বারা চালিত করিবেন।

শিক্ষকদিগকে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের প্রাণ। ছাত্রদিগের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা কোন প্রকারেই খর্ব্ব করা চলিবে না—অবশ্য স্বাধীনতা অর্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। যিনি ইহা মনে রাখিয়া কার্য্য করিবেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক নামের অধিকারী।

শিক্ষক

ছাত্রের পরেই শিক্ষকের স্থান। শিশু আত্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি তাহাই হয়, তবে শিক্ষকের প্রয়োজন কোথায়? বিষয় নির্ব্বাচন করা এবং কোন্ বিষয় তাহার পক্ষে উপযুক্ত, তাহা ঠিক করিবার মতন শক্তি তাহার নাই। জ্ঞানলাভ করিতে সুসংবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ পদ্ধতি কিরূপে কার্য্যকরী করা যায়, তাহা স্থির করিবার মতন নির্ব্বাচন ক্ষমতা শিশুর নাই। একারণে শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষক শিশুকে জ্ঞানলাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিবেন এবং তাহার মনোবৃত্তি সমূহের উপযুক্ত পরিচালনা করিবেন।

বহু পূর্ব্বকালে গৃহে পিতামাতার নিকট শিশুরা শিক্ষালাভ করিত, কিন্তু সমাজের জটীলতার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মবিভাগ পদ্ধতি অনুসৃত হইল এবং এক শ্রেণীর লোকের হস্তে

শিশুদিগের শিক্ষার ভার অর্পিত হইল, ইঁহারাই শিক্ষক নামে অভিহিত।

শিক্ষকের দায়িত্ব কঠিন, অতএব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বে শিক্ষকই শিশুদিগের শিক্ষার পূর্ব্বভাগে অবস্থান করিতেন এবং তাঁহাদের ইচ্ছাই শিশুর মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকিত। কালক্রমে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, শিশুরাই শিক্ষার পূরোভাগে স্থান পাইয়াছে এবং শিক্ষকগণ কেবলমাত্র "পরিচালক" বা "বয়োবৃদ্ধ সঙ্গী"-রূপে পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। শিক্ষককে নিজে চলিলেই হইবে না—ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া চলিতে হইবে, তবে কোলে করিয়া নহে—চলিতে সাহায্য করিয়া মাত্র।

শিক্ষাকার্য্যের দায়িত্ব অসীম। জাতির ভবিষ্যৎ শুভাশুভ সমস্তই নির্ভর করে শিক্ষকগণের উপর। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের শিক্ষকগণের উপর আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় না। অন্য কোন প্রকারে সংসার চালাইতে অক্ষম ব্যক্তিগণ অবশেষে এই ব্যবসায় গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন না যে, যে কোন ব্যবসায় করিতে যাইলে সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করা দরকার। বিনা শিক্ষায় কোন ব্যবসায়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় না। যাহা হউক এক্ষণে মাননীয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং শিক্ষকদিগের "ট্রেনিং" শিক্ষার ব্যবস্থার প্রসার

সাধন করিতেছেন। প্রত্যেক শিক্ষকের তাঁহার দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক এবং সেই দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে সম্পাদন করিবার জন্য "ট্রেনিং" লাভ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষক আদর্শ চরিত্র হইবেন, কারণ শিশুরা স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয় এবং তাহারা শিক্ষককেই অনুকরণ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "ছাত্র পথিক—শিক্ষক পথ প্রদর্শক মাত্র।"

শিক্ষা বিষয়ে নির্দ্ধারিত পাঠ্য

ছাত্র ও শিক্ষকের পরেই শিক্ষা বিষয়ে পাঠ্য-পুস্তকের স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। পাঠ্য বিষয়ের সু-নির্ব্বাচনের উপর শিশু-দিগের শিক্ষা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিশুদিগের বয়সের ও মানসিক শক্তি-বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে না পারিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক থাকে। সাধারণতঃ কোন্ বয়সের ছাত্র কোন্ শ্রেণীতে পড়িতে পারে, তাহার মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন করা হয়। বিষয়ের জন্য পুস্তক-গুলি লিখিত না হইয়া যাহাতে শিশুমনের চিন্তাশক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিশুদিগের জন্যই লিখিত হয়, সে বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনকারী "বোড" অবশ্যই শিশু-মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ এবং তাঁহাদের

নির্ব্বাচন যুক্তিযুক্ত; তথাপি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বও এ বিষয়ে কম নহে। বিভিন্ন অনুমোদিত পুস্তকের মধ্য হইতে, সেই প্রদেশের, সেই স্থানের অধিবাসীদিগের চিন্তাধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুস্তক নির্ব্বাচন করা উচিত। পঠিতব্য বিষয়ের সু-নির্ব্বাচনের উপর বিদ্যালয়ের উন্নতি বহু পরিমাণে নির্ভর করে। ছাত্র ও শিক্ষকের পরেই পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ের স্থান ও গৃহ

ছাত্র, শিক্ষক ও পাঠ্য-পুস্তকের পরেই বিদ্যালয়ের স্থান ও গৃহ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার। কিরূপ স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত? খোলা জায়গা, মাঠ, নদী বা পুষ্করিণীর তীরে বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত। কারণ, এই সকল স্থানে উপযুক্ত আলো ও বাতাসের অভাব হয় না। পরিষ্কার আলোক এবং বিশুদ্ধ বায়ু এই উভয়ই ছাত্রগণের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয়। হাট, বাজার, কোলাহল মূখরিত স্থান, আর্দ্র বা অস্বাস্থ্যকর জমি অথবা গাছপালা দ্বারা আবৃত অন্ধকারময় স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। বাহিরের কোলাহল দ্বারা ছাত্রদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। আর্দ্র বা স্যাঁৎসেঁতে ও অন্ধকারময় স্থানে গৃহ নির্ম্মিত হইলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে।

অবাঞ্ছিত পরিবেষ্টনীর প্রভাব হইতে বিদ্যালয়কে মুক্ত রাখিতে হইবে। শ্মশান বা গোরস্থানের নিকট বিদ্যালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত নহে।

যে জমিতে বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইবে তাহা যেন চতুষ্পার্শ্বস্থিত জমি হইতে কিছু উচ্চ হয়। কারণ, তাহা না হইলে বর্ষার সময় জল প্রবেশ করিতে পারে। দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা উচিত, কারণ দক্ষিণে বারান্দা থাকিলে ঘরে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তরদিক হইতে আমাদের দেশে রৌদ্র আসে না, কাজেই উত্তরদিকে বারান্দা রাখিবার প্রয়োজন নাই। বিদ্যালয়ের দেওয়াল হইতে সোজাসুজি ২০।২২ ফিট্ দূরে দেবদারু, নারিকেল, সুপারি, ইউক্যালিপটাস্ প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিলে স্থানটিও শীতল থাকে, স্কুলেরও শোভা বৃদ্ধি হয়। দূরে আম্র, নিম্ব, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করিলে সুযোগ ও সুবিধা মতন সেই সকল বৃক্ষের তলে শিক্ষাদান কার্য্য চলিতে পারে।

ঘরের ছাদ অন্ততঃ ১৪।১৫ ফিট্ উচ্চ থাকিবে। প্রত্যেক ঘরের আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট্ ও প্রস্থে ১৬ ফিট্ থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক বালকের জন্য মেজেতে অন্ততঃ ১০ বর্গ ফিট্ স্থান রাখা আবশ্যক।

বিদ্যালয়ের গৃহে উপযুক্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। তাহার জন্য যথেষ্ট জানালা থাকা দরকার। মেঝের আয়তনের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ স্থান জানালার

জন্য রাখা উচিত। মেঝে হইতে ৩২ বা ৪ ফিট্ উচ্চে জানালা বসাইবে এবং প্রায় ছাদ পর্য্যন্ত জানালা উচ্চ করা দরকার। বালকদিগের বসিবার বন্দোবস্ত এরূপভাবে করা উচিত, যেন সম্মুখ হইতে আলো আসিয়া চক্ষুর পীড়া না জন্মায়। বাম-দিক হইতে আলো আসিবার ব্যবস্থা রাখাই প্রশস্ত। কারণ, ডানদিক হইতে আলো আসিলে লিখিবার সময় হাতের ও কলমের ছায়া পড়িবে। এই সকল সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

শিক্ষার উপকরণ ও আসবাবপত্র—প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত শিক্ষোপকরণ ও আসবাবপত্রাদি থাকা উচিত। বিদ্যালয়ের আসবাবের মধ্যে, বালকদিগের বসিবার আসন, ডেস্ক, কালবোর্ড ও মানচিত্র, খেলনা ইত্যাদি রাখিবার আলনা বা বাক্স। বালকদিগের বসিবার আসন—নিম্নশ্রেণীর শিশু ঘরের মেঝেতে বসিয়া লেখাপড়া করিতে সুবিধা বোধ করে। তাহাদের জন্য মাদুর বা সতরঞ্চের ব্যবস্থা করা ভাল। উপরের শ্রেণীতে সাধারণতঃ বেঞ্চ ব্যবহার করা হয়, ডেস্ক-সংযুক্ত বেঞ্চই সুবিধাজনক। বেঞ্চের উপর প্রত্যেক বালকের জন্য অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ স্থান থাকা দরকার এবং বেঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে হেলান দিবার কাঠ থাকা উচিত। বেঞ্চগুলি প্রস্থে ১০ ইঞ্চি হইবে এবং বালকদিগের বয়স ও উচ্চতা অনুসারে বেঞ্চগুলি নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। ডেস্কগুলি আনত হইবে নচেৎ লিখিবার সময় অসুবিধা হইবে।

কালবোর্ড—কালবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। কালবোর্ডের রং স্পষ্ট থাকা দরকার। কালবোর্ড শিক্ষকের বামদিকে রাখা সুবিধাজনক, দক্ষিণদিকেও রাখা চলিতে পারে। যেস্থলে অত্যধিক আলোক পতিত না হয়, এরূপ স্থলে বোর্ড রাখা কর্ত্তব্য। কালবোর্ডের ন্যায় মানচিত্র, ছবি, নক্সা প্রভৃতিও শিক্ষাকার্য্যে অত্যাবশ্যকীয় বস্তু।

প্রধান শিক্ষকের কর্ত্তব্য

"ঘড়ির যেমন মেন স্প্রিং, ষ্টীমারের যেমন ইঞ্জিন, বিদ্যালয়ের তেমনি প্রধান শিক্ষক।" প্রধান শিক্ষকের কার্য্য-পদ্ধতির উপর বিদ্যালয়ের সুনাম নির্ভর করে এবং তাঁহার ব্যবহার হইতে আমরা বিদ্যালয়ের অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হই। বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলির প্রতি তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবেঃ—

(১) সময়-পত্র প্রস্তুত, (২) শ্রেণীগঠন ও প্রমোশন বিষয়ে দায়িত্ব, (৩) শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কতদূর পড়াইতে হইবে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তুতকরণ, (৪) অন্যান্য শিক্ষকগণের পঠনকার্য্য পরিদর্শন, (৫) শৃঙ্খলা রক্ষা করা, (৬) বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও খেলাধূলা, (৭) পরীক্ষা গ্রহণ, (৮) ভর্ত্তি ও ট্রান্সফার নিজ তত্ত্বাবধানে করিতে হইবে, (৯) হোষ্টেল থাকিলে তাহার ব্যবস্থা, (১০) বিদ্যালয়ের আসবাব-

পত্র ও শিক্ষার উপকরণ প্রভৃতি রক্ষণ, (১১) বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে উপযুক্ততা অনুযায়ী পড়াইবার দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে। শেষোক্ত বিষয়টি বিশেষ গুরুতর এবং প্রধান শিক্ষকের উপযুক্ততা এই বিষয়েই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়, কারণ প্রত্যেক শিক্ষকের উপযুক্ততা বিচার করিবার মতন শক্তি তাঁহার থাকা দরকার। মোটের উপর, প্রধান শিক্ষককে সর্ব্বদর্শী হইতে হইবে, যতটা মানুষের পক্ষে সম্ভব। বংশগত গুণ এবং অধ্যবসায় ব্যতীত উপযুক্ত হেড্‌মাষ্টার হয় না। এই উভয় প্রকার গুণ থাকা দরকার।

অন্যান্য শিক্ষকের সহিত প্রধান শিক্ষকের সম্বন্ধ কিরূপ হওয়া উচিত? প্রধান শিক্ষকমহাশয় অন্যান্য শিক্ষকদিগকে পরিচালিত করিবেন। তাঁহাকে দেখিতে হইবে—কোন্ শিক্ষক কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই অনুযায়ী পাঠদানের ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষকের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া তাঁহাকে সদুপদেশ দ্বারা চালিত করিবেন। তাঁহাদের সহিত বন্ধুরূপে ব্যবহার করিবেন। অবিরত ভুল ধরিয়া দোষ বাহির করা উচিত নহে। প্রধান শিক্ষককে সকল সময়েই অন্যান্য শিক্ষকদিগের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিতে হইবে।

প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের সমাজের সহিত কিরূপ সম্পর্ক থাকা দরকার? এস্থলে সমাজ বলিতে আমরা প্রধানতঃ অভিভাবকই বুঝিব। প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের মাঝে মাঝে

অভিভাবকদিগকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের সহিত বিদ্যালয়ের সাধারণ উন্নতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা প্রয়োজন। দুর্ব্বল ছাত্রদিগের অভিভাবকদিগকে সেই সকল ছাত্রের যে যে বিষয়ে দুর্ব্বলতা আছে, তাহা জ্ঞাত করাইবেন এবং সকল সময়ই অভিভাবকদিগের সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিবেন। অভিভাবকদিগকে বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ে সকল সময় সচেতন রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অভিভাবকদের সাহায্য ও সহানুভূতি না থাকিলে কোন বিদ্যালয় উন্নত হইতে পারে না।

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধান বা ব্যবস্থা (Organisation of School)

বিদ্যালয়ের কার্য্য সহজ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আমরা কতকগুলি স্থায়ী (Permanent) বন্দোবস্ত ও অনুশাসনের (Laws) ব্যবস্থা করিয়া থাকি। এইগুলি বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানে অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। ইহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ—

(১) স্থিতিশীল, ও (২) গতিশীল।

(১) স্থিতিশীল অংশ, বৎসরকাল ধরিয়া ঠিক একই নিয়মে চলে। যেমন—সময়-পত্রিকা, পাঠোন্নতির ক্রম ইত্যাদি।

(২) গতিশীল অংশ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হয়। যেমন—

পরীক্ষা প্রণালী, পাঠ-দান প্রণালী। স্থিতিশীল অংশই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা—উহার মধ্যে শ্রেণীগঠন, শিক্ষকের কার্য্যকলাপের নির্দ্দেশ, সময়-পত্রিকা প্রস্তুত, হিসাবপত্র-সংরক্ষণ, আসবাব ও শিক্ষোপকরণের সুব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান, অভিভাবকের সহযোগিতা, ছাত্রাবাস পরিচালনা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা শাসনার্থে বস্তু বা ব্যক্তির পরিচালনের জন্য যে সকল বিধি প্রয়োগ করা হয়, তাহাই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা।

শ্রেণীগঠন—(১) একই বয়সের শিশুদের শিক্ষার জন্য একই শ্রেণীতে রাখা হয়। (২) আকৃতিগত—যাহাদের শারীরিক বৃদ্ধি সমান, তাহাদিগকে এক শ্রেণীতে রাখার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। (৩) জ্ঞান—জ্ঞানের বা মানসিক বৃত্তির সমতা-সম্পন্ন শিশুদিগের এক শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। মানসিক উৎকর্ষের জন্য বয়স ও আকৃতিগত শ্রেণীগঠন আদৌ যুক্তি-যুক্ত নহে। শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আকৃতিগত শ্রেণী গঠন করা চলিতে পারে। যেমন—ড্রিল, খেলাধূলা প্রভৃতি।

বিদ্যালয়ের শ্রেণীগঠনের জন্য শিশুদিগের মানসিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণী—সাধারণতঃ তিন প্রকারের শ্রেণীগঠন দৃষ্ট হয়। যেমন—(১) দৃঢ় প্রথা (Rigid System)—সমস্ত ছাত্রকে সমস্ত বিষয় একত্র পড়িতে হয়। (২) স্বাধীন প্রথা (Free System)—এই প্রথা অনুযায়ী

প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক শ্রেণী গঠন করা হয়। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী থাকিবে। (৩) মিশ্র প্রথা (Mixed System)—ইহাতে শ্রেণীর অধিকাংশ বিষয় একত্র শিক্ষা করিতে হয় এবং কতক বিষয়ের জন্য পৃথক্ শ্রেণী গঠিত হয়। সাধারণতঃ সাহিত্য বিষয়ে একত্র শ্রেণী গঠিত হয়। ইহা দৃঢ় ও স্বাধীন প্রথার যুক্ত সমাবেশ।

দৃঢ় প্রথার সুবিধা এই যে, এই ব্যবস্থা অতি সহজ এবং প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেকে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই প্রথার অসুবিধা এই যে, মেধাবী ছাত্রদিগকে দুর্ব্বল ছাত্রদের জন্য জ্ঞাত বিষয়েই পুনঃ মন সংযোগ করিতে হয়। তাহাতে তাহাদের উৎসাহ ও সময় উভয়ই বৃথা ব্যয়িত হইয়া থাকে।

স্বাধীন প্রথায় ছাত্রগণ নিজ নিজ যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে। কিন্তু ইহা আয়াসসাধ্য ও ব্যয়-বহুল। শিক্ষকের ব্যক্তিগত ছাত্রের জন্য দায়িত্ব থাকে না এবং বিশেষ শিক্ষা (Specialisation) অতি শীঘ্রই আরম্ভ হয়। অল্পবয়সে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে।

মিশ্র প্রথা এই উভয় প্রথার মধ্যবর্ত্তী।

শ্রেণীগত পঠনের সুবিধা—(১) সময়, পরিশ্রম ও অর্থের মিতব্যয়িতা হয়। (২) শিক্ষক বিশেষজ্ঞ হইতে

পারেন এবং তাঁহাদের শ্রম বিভাগের সুবিধা হয়। (৩) ছাত্রদের পক্ষে সহযোগিতা সম্ভবপর হয়। (৪) ছাত্রেরা সামাজিক হইবার সুযোগ পায়। (৫) খেলাধূলার বন্দোবস্ত সহজ হয়। (৬) প্রতিযোগিতা, অনুকরণ, আত্মোৎসর্গ ইত্যাদির সুযোগ থাকে। (৭) সকলেই এক সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। (৮) শ্রেণীপঠনের দ্বারা শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র উপকৃত হয়।

শ্রেণীগত পঠনের অসুবিধা—(১) ইহাতে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। (২) অতি উত্তম ছাত্রের পাঠের ব্যাঘাত জন্মে। নিকৃষ্ট ছাত্রকে অবহেলা করা হয়। (৩) স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্ভাবনা থাকে। (৪) শিক্ষকের পক্ষে পরিদর্শন-কার্য্য কঠিন হয়। (৫) দুর্ব্বল-চরিত্র ছাত্রের অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে। (৬) প্রতিযোগিতার আতিশয্য, ঈর্ষ্যা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির ভয় থাকে।

এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রেণীগত পঠন ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই। ব্যক্তিগত পঠনের ব্যয় অত্যন্ত অধিক এবং উহার জন্য সর্ব্ব-বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়,—ইহা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একটি শিক্ষকের প্রয়োজন হইলে—শিক্ষালাভ অসম্ভব হইত।

শ্রেণীগত পঠনের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। শ্রেণীগত পঠনের প্রধান অসুবিধা হইতেছে—শিশুদিগের মধ্যে শিক্ষা করিবার ক্ষমতার পার্থক্য।

একজন যাহা এক ঘণ্টায় শিক্ষা করে, অপরের তাহা আয়ত্ব করিতে হয়তো দুই ঘণ্টা লাগে। এইজন্য মেধাবী ছাত্রদিগকে দুর্ব্বল ছাত্রদের জন্য অযথা সময় নষ্ট করিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। তন্মধ্যে ডাল্টন প্ল্যান, মাণ্টেসরি মেথড্, উননেট্‌কী প্ল্যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট।

শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য

শিক্ষককে প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি সম্যক পরিস্ফুট ও বর্দ্ধিত হয়। ইহার জন্য তাঁহাকে আত্মনির্ভর এবং আদর্শ-চরিত্র হইতে হইবে। আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে শিক্ষকতা কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায় না। অদ্যকার শিশু আগামীকল্যের নাগরিক। উপযুক্ত নাগরিক প্রস্তুত করিবার ভার শিক্ষকগণের উপরই ন্যস্ত। নিজে প্রথমে কোন বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইয়া তৎপরে তাহা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে বিষয়ে নিজের মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাহা শিক্ষা দিতে যাওয়া ভুল। কারণ, তাহা হইলে শিক্ষক কখনও সেই বিষয় শিশুদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবেন না। অস্থির চিত্ত শিক্ষক কখনও সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। নিজের বিচার বুদ্ধি ও নৈতিক দৃঢ়তার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। শিষ্টাচারী

ও শান্ত স্বভাবসম্পন্ন শিক্ষক ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। কথাবার্ত্তা ও চালচলনের ভিতর সরসতা থাকা কর্ত্তব্য, তবে নিরর্থক রসিকতা বিপদজনক। শিক্ষক আন্তরিক সজাগ, মিষ্টভাষী ও হৃষ্টচিত্ত হইবেন। তাঁহার ভিতর দরদী প্রাণের অভাব লক্ষিত হইলে তাহা শিশুদিগের মনের উপর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ক্লাসের বাহিরেও শিক্ষকের কর্ত্তব্য আছে। ছাত্রদের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষকের প্রতি ছাত্রগণ খুব শীঘ্র আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। খেলা-ধূলা বিষয়ে ছাত্রদের সহিত সহযোগিতা করা উত্তম শিক্ষকের লক্ষণ। শুধুই প্রভুত্ব করিব—এই ভাব মন হইতে দূর করিয়া ছাত্রদের পরিচালক বা "সঙ্গীরূপে" নিজেকে চালিত করিতে হইবে।

শ্রেণীর শৃঙ্খলা-বিধান
(Class Management)

শ্রেণীর ব্যবস্থা-বিধানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় শৃঙ্খলা বিধানের। শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন কাজই ঠিকমত চালান দুষ্কর হইয়া উঠে। শৃঙ্খলা দ্বারা শ্রেণীর কার্য্য সহজ হয় এবং শারীরিক ও মানসিক অসুবিধাগুলি দূর করা সম্ভব হয়। শ্রেণীর মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য আমাদিগকে সময় সময়

শাস্তি প্রদান করিতে হয়। শাস্তি প্রয়োগ দ্বারা বালকের আচরণ পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, কিন্তু স্থায়ী ফল লাভ করা যায় না। স্থায়ী ফল লাভ করিতে হইলে শিশুদের আচরণগুলি স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করিতে হইবে। যতক্ষণ শাস্তির ভয় বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ—তাহার পরেই শিশু পুনরায় অন্যায় আচরণ করিতে উদ্যত হইবে। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের প্রতি একই প্রকারের শাস্তি বিধান করা অনুচিত। একটি দশ বৎসরের বালককে যে অন্যায় কার্য্যের জন্য যে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে ঠিক সেই অন্যায়ের জন্য একটি পাঁচ বৎসরের শিশুকে সেই শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে না। যদি দেওয়া হয়, তাহা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইবে। বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। একটি পাঁচ বৎসরের শিশুকে দৃঢ় দৃষ্টি দ্বারা শাসন করিতে পারা যায়, কিন্তু একটি আট বৎসরের বালকের পক্ষে তাহা যথোপযুক্ত হইবে না। বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শৃঙ্খলা বিধান করা কর্ত্তব্য। একই প্রকারের ব্যবস্থা সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

পুরস্কার ও শাস্তি

আজকাল অনেকে পুরস্কার প্রদানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, পুরস্কার দ্বারা বালকের স্বাধীনতা

হরণ করা হয়। পুরস্কারের প্রত্যাশায় বালক কাজ করে—কাজ করা উচিত, সেজন্য কাজ করে না—কাজের প্রতি তাহার স্বাভাবিক ঝোঁক বা আকর্ষণ থাকে না। অপর পক্ষে বিদ্যালয়ের পাঠে ও অন্যান্য কার্য্যে শিশুদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কার দিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। পুরস্কার ব্যতীরেকেও শিশুদের মধ্যে কার্য্যে আসক্তি যে জন্মান যায় না, তাহা নহে, কিন্তু সেরূপ শিক্ষক অত্যন্ত বিরল।

পুরস্কার প্রদান করিবার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—শিক্ষা তথা চরিত্র গঠন। ইহা করিতে হইলে কোন একটি বিশেষ কার্য্যের জন্য পুরস্কৃত করা উচিত নহে। অধ্যবসায় ও ক্রমাগত চেষ্টার ফলকে পুরস্কৃত করা উচিত। পুরস্কারের লোভে কোন কাজ হয়তো কোন বালক একবার হঠাৎ ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারে। তাহা বলিয়া সেই স্থলে পুরস্কৃত করিতে যাওয়া উচিত নহে। তৎপরে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে পুরস্কারের সংখ্যা কম হয় এবং সহজলভ্য না হয়। স্বাভাবিক প্রতিভার জন্য পুরস্কার দেওয়া উচিত। পুরস্কার অত্যন্ত অল্প মূল্যের হওয়া উচিত। বই, প্রশংসা-পত্র, বিদ্যালয়ের কোন পদ ইত্যাদি দ্বারা পুরস্কৃত করা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। মূল্যবান্ দ্রব্য দ্বারা পুরস্কৃত করিলে দ্রব্যের প্রতিই বালকগণ অধিক আকৃষ্ট হয় এবং তাহা হইলে পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। অনেক সময় শিক্ষকের একটিমাত্র প্রশংসা-সূচক বাক্যই পুরস্কারের কাজ করিতে পারে।

পুরস্কার প্রদান দ্বারা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু ইহা সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, এই প্রতিযোগিতা যেন অসার রেশারেশিতে পরিণত না হয়। অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। পারিতোষিক দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রেরণা আনয়ন করা যায়। যেখানে প্রতিযোগিতার ভাব প্রতিযোগিদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যায়—উৎসাহ ও প্রেরণা দেয় এবং ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই প্রশংসা কার্য্যে লিপ্ত হয়—পুরস্কার সেইখানেই কার্য্যকরী হয়।

কি কি উদ্দেশ্যে পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে ?

(১) নিয়মিত দৈনিক উপস্থিতির জন্য (Regular Attendance)—এই অবস্থার দ্বারা নিয়মিত উপস্থিত ও নিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়।

(২) সৎ চরিত্রতার (Good Conduct) জন্য পুরস্কার বিপদ্জনক। যে সকল ছাত্র দীর্ঘকাল ধরিয়া সৎচরিত্র ও দৃঢ়চেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করে—অবস্থা বিশেষে কেবলমাত্র তাহাদেরই ইহা প্রদান করা যাইতে পারে। কোন একটি প্রশংসাজনক কার্য্যের জন্য ইহা দেওয়া উচিত নহে। এই পুরস্কার কোন পদক, পুস্তক অথবা কোন জিনিষ দ্বারা হইবে না—ছেলেদের মধ্যে কোন সম্মানজনক পদ দেওয়া যাইতে পারে। পুরস্কারের প্রত্যাশায় সৎচরিত্র হইতে চেষ্টিত না হইয়া সমস্ত বিদ্যালয়ের সুনামের জন্য ছাত্রেরা যাহাতে চেষ্টিত হয়, তাহাই দেখিতে হইবে।

(৩) পাঠোন্নতির জন্য পুরস্কৃত করা যাইতে পারে—ইহা ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট 'টনিকের' কাজ করে।

চরিত্রের প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনই পুরস্কারের উদ্দেশ্য। যেখানে 'করিও' অথবা 'করিও না' বলিলেই যথেষ্ট হয়, সেখানে পুরস্কৃত করিতে যাওয়া উচিত নহে। মিথ্যা বলার জন্য ছাত্রকে শাস্তি দিব, কিন্তু সত্য বলার জন্য পুরস্কৃত করিব না। মৌখিক প্রশংসা কোন জিনিষ দিয়া পুরস্কৃত করা অপেক্ষা কার্য্যকরী হয়।

শাস্তি ঃ—আমাদের জীবনে এমন এক একটি সময় আসিয়া পড়ে, যখন শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুষ্ঠিত হয়। শাস্তি দিবার সময় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, যেন তাহা দ্বারা শিশু সংশোধিত হয়; ভবিষ্যতের জন্য এই প্রকারের অপরাধ যাহাতে অনুষ্ঠিত না হয় এবং তাহা যেন দোষীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়।

শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষা—দোষীকে সংশোধন করা। যেখানে শাস্তি প্রদান দ্বারা কোন প্রকারের শিক্ষা লাভ না হয়—সেখানে শাস্তি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা উচিত নহে। ঠিক যে পরিমাণ শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, তাহাই প্রদান করা উচিত। শাস্তির পরিমাণও শিশুদিগের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঠিক করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষকের ইহা মনে রাখা উচিত যে, যত কম শাস্তি দিতে পারা যায়, ততই মঙ্গল।

কিন্তু প্রয়োজন হইলে যদি শাস্তিদানে বিরত থাকা যায়, তাহার মত ভুল আর হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে দোষী ব্যক্তি আরো অধিক দোষ করিতে থাকিবে। শাস্তির প্রয়োজন হইলে শাস্তি দিতেই হইবে এবং শাস্তি প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। সকল সময় ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য 'শিক্ষা'। শাস্তি প্রদান দ্বারা আমরা শিশুকে সেই কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে চেষ্টা করি এবং অপর শিশুরা তাহা দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছেলেদের কয়েকটি উপায়ে আমরা শাসন করিতে পারি। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, যত কম শাস্তি দিবার প্রয়োজন হইবে, ততই মঙ্গল।

(ক) **আটক রাখা**—যাহারা নিয়মিত পড়ায় অবহেলা করে এবং 'বাড়ীর কাজ' করে না, তাহাদিগকে আটক রাখিতে হইবে। আটক থাকিবার সময় ছাত্রেরা যেন মনে করে যে, তাহারা নিয়মিত শ্রেণীতে আছে। শিক্ষক উপস্থিত থাকিবেন এবং তাহাদের নিকট হইতে পড়া আদায় করিয়া লইবেন। কখন আটক রাখা উচিত? যখন অপর ছাত্রগণ খেলা করিবে, সেই সময়ই আটক রাখা উচিত।

(খ) **জরিমানা**—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শাস্তি। সাধারণতঃ ছেলেদের জরিমানা করা উচিত নহে। তাহা হইলে তাহাদের অভিভাবকগণকেই ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। কিন্তু যাহারা বিলম্বে আসে, তাহাদের অভিভাবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জরিমানা

করা উচিত, কারণ বিলম্বে আসিবার জন্য প্রধানতঃ অভিভাবকগণই দায়ী। তাঁহাদের দেখা উচিত যে, শিশু যাহাতে নিয়মিত সময়ে গৃহ হইতে যাত্রা করে। বিদ্যালয়ের জিনিষপত্র ইত্যাদি নষ্ট করিলে জরিমানা করা যাইতে পারে।

(গ) **শারীরিক শাস্তি**—যখন কোন বালক উপর্য্যুপরি একই প্রকারের দোষ করিতে থাকে, তখন তাহাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। প্রধান শিক্ষক ব্যতীত অপর কেহ ইহা দিবেন না। অনেক সময় অভিভাবকগণ শারীরিক শাস্তি প্রদানে আপত্তি করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে শারীরিক শাস্তি দিতে ইতস্ততঃ বা অভিভাবকের অনুরোধে বন্ধ করা উচিত হইবে না। সেই স্থলে সেই বালককে শাস্তি দিবার পর স্কুল হইতে নাম কাটিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু ট্রান্‌স্‌ফার সার্টিফিকেট দিবে না।

(ঘ) **বেত্রাঘাত**—বেত্রাঘাত শারীরিক শাস্তির অংশ বিশেষ। বেত্রাঘাত সময় সময় প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যেমন শান্তিপূর্ণ অবস্থায়ও দেশের মধ্যে সৈন্যদল রাখা হয়, শান্তিরক্ষার্থে সেইরূপ বিদ্যালয়ের 'বেত'ও রক্ষা করিতে হইবে। শান্তিরক্ষার জন্য বেতের প্রয়োজন। একমাত্র প্রধান শিক্ষকই বেত্রাঘাত করিতে পারেন এবং তাহাও ধীর মস্তিষ্কে করা উচিত।

(ঙ) **বহিষ্করণ**—যে বালককে কোন প্রকারেই সংশোধন করা যায় না, এমন কি তীব্র শারীরিক শাস্তি প্রদানেও কোন

ফল হয় না, সেই বালককে বাহির করা ব্যতীত উপায় থাকে না। পরীক্ষায় নকল ইত্যাদি করিলে সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য বাহিষ্কার করা হয় (Rustication), কিন্তু যেখানে সেই বালক স্কুলের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অন্যান্য ছাত্রের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে, সেইস্থলে তাহাকে চিরতরে বহিষ্কার করা উচিত (Expulsion)। এই সকল বালকের দ্বারা বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই প্রকারের বালক কিছুতেই সংশোধিত হইতে চাহে না।

যে বিদ্যালয়ে শাস্তি প্রদানের আধিক্য লক্ষিত হয়, সেই বিদ্যালয়ে সুশাসনের অভাব ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। শাস্তি যেন প্রতিহিংসামূলক না হয় এবং পারিতোষিক যেন উৎকোচে পরিণত না হয়।

শিক্ষাদানের কৌশল
(Devices of Teaching)

পাঠদানকালে যাহাতে শিশুদিগের মনোবৃত্তিগুলি সম্যক্ পরিচালিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত। তাহা না হইলে শিশু নূতন জ্ঞান কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। শিক্ষাদানের কৌশলগুলি আমরা সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারি :—

(১) প্রশ্ন, (২) উহ্য শব্দাদির সম্পূরণ, (৩) প্রদীপন (illustration) ও (৪) বর্ণনা।

(১) প্রশ্নদ্বারা শিশুদিগের মনোযোগ স্থির রাখিতে পারা যায়। পাঠদানকালে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, শিশুদিগের নিকট হইতে প্রশ্নদ্বারা পাঠদান কার্য্য অগ্রসর করাইতে হইবে। প্রশ্নোত্তর দ্বারা শিশুদিগের অজ্ঞতা দূর হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল সময়েই অবিরত প্রশ্ন করা উচিত নহে। যখন বুঝাইয়া দেওয়া দরকার, তখন বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং যখন প্রশ্ন করা উচিত, তখন প্রশ্ন করিতে হইবে। প্রশ্ন সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়—যেমন (১) পরীক্ষা-মূলক ও (২) শিক্ষামূলক। শিশুর পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত নূতন বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে ; এইজন্য শিশুর পূর্ব্বজ্ঞান বিষয়ে অবহিত হইতে হইলে পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করিতে হইবে। ইহাদ্বারা শিশুর পূর্ব্বজ্ঞান ও পূর্ব্ব পাঠের শিক্ষা বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট হয়। পরীক্ষামূলক প্রশ্ন দ্বারা শিশুর নূতন পাঠের প্রতি মন আকৃষ্ট করিতে হইবে। এরূপ-ভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে, যেন শিশু তাহা দ্বারা নূতন কিছু জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। পরীক্ষামূলক প্রশ্ন দ্বারা নূতন পাঠের বিষয়ে শিশু কতখানি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারা যায় এবং জটিল অংশসমূহ বুঝাইয়া দিবার সুযোগ আসে। পাঠের শেষভাগে পরীক্ষামূলক প্রশ্ন দ্বারা পাঠের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ শিশুর মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়।

(২) শিক্ষামূলক প্রশ্ন :—শিক্ষামূলক প্রশ্ন দ্বারা শিশুর মনোযোগ পাঠের বিভিন্ন অংশে নিবিষ্ট হয় এবং দুইটি বিষয়

বা বস্তুর মধ্যে তুলনা ও সম্বন্ধ স্থাপন কার্য্য সহজ হয়। জটিল বিষয় সহজ হয় এবং যুক্তির সাহায্যে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রশ্ন কিরূপ হইবে ঃ—সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট হইবে। দ্বিত্বার্থবোধক প্রশ্ন কখনও করা উচিত নহে। একটিমাত্র উত্তর হইবে এবং তাহা অসম্বদ্ধ না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রশ্ন দ্বারা যাহাতে শিশুগণ তাহাদের চিন্তাশক্তির সম্যক ব্যবহার করিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। প্রশ্ন নিতান্ত সাধারণ ও সহজ হইবে না এবং এমন প্রশ্ন করিবে না, যাহাতে উত্তর নির্দ্দেশ করা থাকে, অথবা কেবলমাত্র 'হাঁ' বা 'না' উত্তর হয়—এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে এবং প্রশ্নগুলি যেন সুসংবদ্ধ হয়।

(৩) উহ্য শব্দাদির সম্পূরণ ঃ—প্রশ্নের ন্যায় উহ্য শব্দাদির সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। শিশুগণ সম্পূর্ণ বাক্য রচনা করিতে পারে না, সেই অবস্থায় তাহাদের শব্দ পূরণ করিতে দিলে ফল ভাল হইবে; যথা—'কুকুরের চারিটি—'

(৪) প্রদাপন ঃ—যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা লাভ করা সম্ভবপর নহে এবং এরূপ জটিল যে, শিশুরা তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না, সেই সকল বিষয় শিশুদের বুঝাইয়া দিতে হইবে। প্রদীপনকার্য্য সাধারণতঃ পাঁচ প্রকারে করা যাইতে পরে; যথা—(ক) বস্তু—নানাবিধ বস্তুর সাহায্যে বস্তুর পাঠ ও সংখ্যা গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়। (খ) আদর্শ—কোন বস্তুর বিষয়ে পাঠদানকালে সেই বস্তুর আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত করিলে শিশুদিগের বুঝিবার

পক্ষে সহজ হয়। (গ) ছবি ও নক্সা—ছবি ও নক্সা উপস্থিত করা যায় অথবা ব্লাকবোর্ডে ছবি ও নক্সা আঁকিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়। ছবি অপেক্ষা ব্লাকবোর্ডে অঙ্কন শিশু-মনের উপর অধিক কার্য্যকরী হয়। (ঘ) মানচিত্র—ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষাদান কার্য্যে মানচিত্রের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। (ঙ) পরীক্ষণ (Experiment)—বিজ্ঞান শিক্ষাদানকালে পরীক্ষা দ্বারা শিশুদিগের প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি বুঝাইতে হইবে। বাষ্প, মেঘ প্রভৃতির কি প্রকারে উৎপত্তি হয়, তাহা পরীক্ষণের সাহায্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

পাঠের অনেক স্থলে শিক্ষক দৃষ্টান্ত বস্তু বা চিত্র উপস্থিত করিতে পারেন না। সেই সকল স্থানে নানাবিধ উপমা দ্বারা বিষয়সমূহের সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

পাঠটীকা প্রস্তুতকরণ

পাঠটীকা প্রস্তুত করিবার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুদের বিভিন্ন মানসিক শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রেণীর উপযোগী করিয়া পাঠটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠটীকা সমাপ্ত করা যায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপযোগী পাঠটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অসম্পূর্ণ অবস্থায় কোন পাঠ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। পরবর্ত্তী পাঠের 'সূচনার' সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠের

'প্রয়োগের' ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পাঠের সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে। ইহার মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য, যেমন শিশুদের জ্ঞানবৃদ্ধি, মানসিক শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি এবং বিশেষ উদ্দেশ্য থাকিবে, যেমন কুকুরের আকৃতি ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ইত্যাদি। পাঠের প্রারম্ভেই শিশুদিগকে পাঠের উদ্দেশ্য বিষয় জ্ঞাত করিতে হইবে। তাহা হইলে পাঠদানকার্য্য উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাহা না হইলে মন বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন বিষয়ে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। যে সকল উপকরণ প্রয়োজন হইবে, তাহা পাঠটীকায় লিখিত হইবে এবং পাঠদান কার্য্যের পূর্ব্বেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে; যেমন—'বাবর' বিষয়ে পাঠটীকায় মানচিত্র, বাবরের ছবি, বংশতালিকা ইত্যাদি। পাঠদান করিতে করিতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে সময় নষ্ট করিলে শ্রেণীর শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাইবে। পাঠটীকা সুস্পষ্ট করিতে হইলে আবশ্যকমত ব্ল্যাকবোড, ছবি, নক্সা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠটীকা উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য যে পরিমাণ প্রদীপনের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত, তাহা করিতে হইবে। অনেকে পাঠটীকাতে বিষয় ও প্রণালী পৃথকভাবে লিখিয়া থাকেন। পাঠে যে সকল তথ্য শিশু শিক্ষা করিবে, তাহা 'বিষয়ের' ঘরে এবং যে প্রণালী অবলম্বন করা হইবে, তাহা 'প্রণালীর' ঘরে দেখান হয়। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও যুক্তিমূলক পদ্ধতি অবলম্বনে বিষয়গুলি ধারাবাহিকরূপে সজ্জিত করা উচিত।

ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পাঠটীকা প্রস্তুত করিবার কোন বাঁধাধরা (Stereotyped) নিয়ম থাকা উচিত নহে। শিক্ষক তাঁহার বিচার ও চিন্তা শক্তির সাহায্যে স্বাধীন-ভাবে পাঠটীকা প্রস্তুত করিবেন। পাঠদানকালে হয়তো এরূপ বিষয়ের অবতারণা হয়, যাহা শিক্ষক পাঠটীকা প্রস্তুত করিবার সময় চিন্তা করেন নাই। প্রত্যেক শিক্ষকের পাঠটীকা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে পাঠটি উত্তমরূপে আয়ত্ব করা উচিত। অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ বিশদ পাঠটীকা প্রস্তুত করেন না, কিন্তু নূতন শিক্ষকদের পক্ষে পাঠটীকা বিশদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা—হাতে-কলমে শিক্ষা

এতাবৎ কাল শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মনের মধ্যে কতকগুলি বিষয় 'পাম্প' করিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, তাহারা বুঝুক বা নাই বুঝুক সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হইত না। যে কোন উপায়ে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারিলেই হইল। শিশুদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'মানুষ'-রূপে গণ্য করা হইত এবং সমাজের চাহিদা অনুযায়ী তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশুদিগের যে নিজস্ব চিন্তাধারা বর্ত্তমান, তাহাদেরও যে নিজস্ব কর্ম্মপদ্ধতি আছে কাহা ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের শিক্ষণীয় বিষয়সমুহ শিক্ষা দেওয়া হইত।

বিভিন্ন সময়ে সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই সকল জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনে কখন কোন দিন কার্য্যকরী হইবে কিনা এবং কার্য্যকরী করিতে হইলে কি করা প্রয়োজন, তাহা চিন্তা করা হইত না। তোতাপাখীর মতন মুখস্থ করান হইল এবং তাহা হইলেই যথেষ্ট বিবেচিত হইত।

কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষার উপরোক্ত পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহাতে অর্জ্জিত জ্ঞান 'হাতে কলমে' কাজ করিয়া ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যকরী করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, কেবলমাত্র পুস্তকে পঠিত জ্ঞান জীবনে কার্য্যকরী হয় না।" এই মতই এক্ষণে প্রবল এবং তাহার জন্য বহু মনীষী নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

এ বিষয়ে মহাত্মা ফ্রোবেল প্রবর্ত্তিত 'কিণ্ডার গার্টেন' পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতে শিশু মাতৃক্রোড়েই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। প্রকৃতিই শিশুর উত্তম শিক্ষয়িত্রী। শিশুর খেলা করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক; এই প্রবৃত্তির সাহায্যে শিশুর জীবনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান, অভ্যাস গঠন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ফ্রোবেল শিক্ষককে উদ্যানপালকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। উদ্যানপালক যেমন অনুকূল জল, রৌদ্র, বাতাস ও মৃত্তিকার সাহায্যে চারাগাছগুলিকে বাড়িবার জন্য ও সমৃদ্ধ হইবার জন্য

সাহায্য করে, সেইরূপ শিক্ষকও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া শিশুকে বাড়িয়া উঠিবার ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ হইতে সাহায্য করেন। সকল চারাগাছ যেমন একই প্রকারের সার বা জমিতে বর্দ্ধিত হয় না, বিভিন্ন প্রকারের জমি বা সার প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সকল শিশুর পক্ষে একই প্রকারের আবেষ্টনী কার্য্যকরী হয় না। চারাগাছের নিজের মধ্যে বাড়িয়া উঠিবার শক্তি বর্ত্তমান, অনুকূল আবহাওয়ার সাহায্যে উক্ত শক্তি বিকশিত হইয়া উঠে। সেইরূপ প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই নিজে নিজে বর্দ্ধিত হইবার শক্তি বর্ত্তমান—ইহাই উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর সাহায্যে বিকশিত হয়। শিক্ষকের কর্ত্তব্য হইবে—শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করা, যাহার সাহায্যে শিশুর শক্তি-সমূহ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। এই আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিবার সময়েও শিক্ষককে নিজের খেয়াল বা ইচ্ছা অনুযায়ী চলিলে হইবে না, শিশুর প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিশু-প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করা চলিবে না।

কিণ্ডার গার্টেন ক্রীড়নক সাহায্যে ফ্রোবেল শিশুদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল ক্রীড়নকের সাহায্যে খেলার ছলে শিক্ষা দেওয়া হয়।

হাতে-কলমে কোন বিষয় শিক্ষা করিলে যেমন তাহা মনের উপর গভীর ছাপ অঙ্কিত করে এবং কার্য্যকরী হয়, কেবল-মাত্র পুস্তক হইতে অর্জ্জিত জ্ঞান কখনও সেইরূপ কার্য্যকরী হইতে পারে না।

ডাল্টন প্রথা (Dalton Plan)

এই প্রথা মিস্ পার্কহার্ষ্ট নাম্নী জনৈক আমেরিকান শিক্ষা-ব্রতী দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা প্রথমে ডাল্টন নামক স্থানের স্কুলে প্রচলন করা হয় বলিয়া ইহার নাম ডাল্টন প্রথা।

এই প্রথার নিয়মঃ—সকলকে একই বিষয় শিক্ষার জন্য একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই কক্ষে আটক রাখা যুক্তিযুক্ত নহে। কেহ যে কাজ ১ ঘণ্টায় করিতে পারে, অপরে তাহাই হয়তো অর্দ্ধ ঘণ্টায় করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং মিস্ পার্কহার্ষ্ট মহাশয়ার মতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়-পত্রিকা (Time-table) থাকা উচিত নহে। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিনের (যেমন ১ পক্ষ) জন্য প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্য-সূচী নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাকে কি কি বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে—মোটামুটী তাহার আলোচনা করিয়া দেওয়া হইবে, ছাত্রগণ নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী যে বিষয়ে যত অধিক বা অল্প সময় ক্ষেপন করা প্রয়োজন মনে করিবে, তাহাই করিবে। কোন বিষয়ে সাধারণভাবে পাঠ দেওয়া হইবে না। শিক্ষকগণ সকল ছাত্রদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত থাকিবেন। শ্রেণীকক্ষ থাকিবে না। তাহার স্থলে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষ (Subject-room) থাকিবে। ইহা কার্য্যাগারের (Laboratory) ন্যায় হইবে। ছাত্রগণ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে কার্য্যাগারে উপস্থিত হইবে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত পাঠনের মধ্যবর্ত্তী ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু

ইহার কতকগুলি ত্রুটী আছে। কতকগুলি বিষয়ের জন্য (যেমন কবিতা) শ্রেণীগত পঠনের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ অল্পবয়সী ছাত্র, যাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান সুদৃঢ় হয় নাই, তাহাদের পক্ষে ইহা উপযুক্ত নহে। যে সকল ছাত্র পড়াশুনায় অবহেলা করে, তাহাদের কার্য্য বিলম্বে ধরা পড়ে—ইহা তাহাদের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

"ডাল্টন প্রথা শ্রেণীগত পঠনের মৃত্যু ঘটাইয়াছে"—ইহাই মনীষিগণের অভিমত।

বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

১৯১০ ও ১৯১১ খৃঃ মহাত্মা গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা বিফল হয়। পরে কেবল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট ১৯১৯ খৃঃ পাশ হয়। এই প্রথমবার ইহা মিউনিসি-প্যালিটী সমূহে প্রযুক্ত হইল এবং বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী যে সকল ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে, তাহাতেও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ইহা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

বিস্ স্কীম—১৯২০ খৃঃ আগষ্ট মাসে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট মিঃ ইভান. ঈ. বিস্ সাহেবকে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য নিয়োগ করেন। তিনি দুইটি রিপোর্ট দিয়াছিলেন, প্রথমটি

১৯২১ ও অপরটি ১৯২২ খৃঃ। প্রথম রিপোর্টে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, বাঙ্গলা প্রদেশ মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সি হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বহু পশ্চাৎপদ। তৎকালে বাঙ্গলায় শতকরা ৬·৯, মাদ্রাজে ২৬·৯ ও বম্বেতে ৮০·৭টি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান ছিল। তিনি প্রত্যেক জনবহুল স্থানে অর্দ্ধমাইল বৃত্তাকার মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে উপদেশ দেন। সকল জাতির শিশুরাই ইহাতে অধ্যয়ন করিবে এবং কোন সমাজের জন্য কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইলে সেই শ্রেণীর সমান অন্য শ্রেণী গঠন করিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্কুলে ৩০০ ছাত্রের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা অভিপ্রেত বিষয়সমূহ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক ইংরাজীও স্থান বিশেষে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়কে পাবলিক প্রাইমারী স্কুল পরীক্ষা দিতে হইবে। এই সকল বিদ্যালয় চালাইবার জন্য খরচপত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে একটি ছাত্র শিক্ষা দিতে মোটামুটি ৩·৫ টাকা খরচ হয়, কিন্তু বম্বেতে ১৫৲ খরচ হয়। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের লোক তাহাদের সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় করে। বাঙ্গালাদেশে ছাত্রবেতন বৎসরে ১॥৶০, কিন্তু অন্য কোন প্রদেশে তাহার অর্দ্ধেকও অভিভাবকদিগকে বেতনস্বরূপ দিতে হয় না। সরকারী তহবিল হইতে বাঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অতি অল্পই ব্যয়িত হয়।

মিঃ বিসের মতে মিউনিসিপ্যালিটী ও গ্রাম্য এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করিতে হইলে ১,৭১,০৬,২০৫ টাকা প্রয়োজন। কিন্তু উহার সহিত কলিকাতা যদি যুক্ত হয়, তবে প্রায় ৪ কোটী টাকা (Non-recurring 2 crores এবং recurring 2 crores) ব্যয় হয়।

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট বিস্ সাহেবের স্কীম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কতক স্থানে তাহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উহার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যেক দিকেই কিছু উন্নতি সাধিত হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ২ লক্ষ ছাত্র প্রায় ৬০ হাজার বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে। ইহার মধ্যে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৫৪ জন এবং হিন্দু ও অন্যান্য জাতি শতকরা ৪৬ জন।

কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রায় ৮৪,০০,০০০ টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিয়াছে, তন্মধ্যে সরকারী তহবিলের ২৬,০০,০০০ টাকা এবং ১৮,০০,০০০ টাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ হইতে এবং বাকী ৪০,০০,০০০ টাকা অভিভাবক কর্ত্তৃক ফি ও চাঁদা বাবদ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার এত গলদ ছিল যে, শিশুশ্রেণীতে ১০০ ছাত্রের মধ্যে মাত্র তিনজন ৪র্থ শ্রেণীতে পেঁ ৗছিতে সক্ষম হইত।

কলিকাতা কর্পোরেশন ২৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকিতেন। এই সকল বিদ্যালয়ে ৩৫ হাজার বালক ও বালিকা অধ্যয়ন করিত এবং প্রতি বৎসর সাহায্য হিসাবে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সাহায্য

প্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলে দিয়া থাকেন। এতাবৎকাল মধ্যে কেবলমাত্র চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রাথমিক শিক্ষা এ্যাক্ট প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯৩৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইহার একটি ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের অনুমতি লাভ করেন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দের বেঙ্গল প্রাইমারী শিক্ষা এ্যাক্ট ১৯৩২ খৃঃ অব্দে সংশোধিত করা হয়, কারণ উহা দ্বারা বালিকাদের উপর উক্ত এ্যাক্ট প্রযোজ্য হইয়াছে। ১৯২২—১৯২৭ খৃঃ পঞ্চ বার্ষিকী রিপোর্টে দেখা যায় যে, শিক্ষকদিগের বেতন কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি জেলায় ইহা কম হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগে সাহায্যবিহীন স্কুলে শিক্ষকের বেতন মাত্র ৩৶০ ছিল। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলেও ৬৲ টাকার অধিক বেতন ছিল না।

১৯১৯ ও ১৯২১ খৃঃ অব্দে প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তনের পক্ষে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের দারিদ্র্যতা ও অনিচ্ছাই প্রবল ছিল। কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই হইবে না, সেই সঙ্গে টাকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের দোষ-ত্রুটী সকল সংশোধনার্থে ১৯৩০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার গ্রাম্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিলটি ১৯২৬ খৃঃ অব্দ হইতেই প্রচলিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হন এবং বহুবিধ বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া ১৯৩০ খৃঃ অব্দের ২৬শে আগষ্ট ইহা পাশ হয়।

১৯২৬ খ্রঃ অব্দ হইতেই সেস্ প্রবর্ত্তন ও জেলা স্কুলবোডের প্রবর্ত্তনের কথা গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিয়া আসিতেছেন।

১৯৩০ খৃঃ আইন দ্বারা গভর্ণমেণ্ট গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও স্কুলসমূহ উপযুক্তরূপে পরিচালনা ও ব্যবস্থার জন্য জিলা স্কুলবোর্ড স্থাপন করিতেছেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সেস্ ধার্য্য করা হইতেছে।

সময়-পত্রিকা

সময়-পত্র দ্বারা আমরা বিদ্যালয়ের কার্য্য-বিভাগ বুঝিতে পারি। কোন্ শিক্ষক কোন্ বিষয়ে, কখন কোন্ শ্রেণীতে পাঠ দিবেন, তাহা জানা যায়। প্রধান শিক্ষককে সময়-পত্র প্রস্তুত করিবার নিয়মগুলি জানা দরকার। সময়-পত্র তিন প্রকার; যথা—(১) শিক্ষকদিগের কার্য্য-বিভাগ; (২) বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়-বিভাগ; (৩) বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদিগের জন্য পাঠের পৃথক তালিকা। সময়-পত্র প্রস্তুত কালে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, কি পরিমাণ সময় প্রতি পাঠে ব্যয় করা উচিত, তাহাই প্রথমে স্থির করিতে হইবে। ইহা বালকদিগের বয়সের উপর নির্ভর করে। কারণ, বিভিন্ন বয়সে বালকদিগের মনোযোগ কোন একটি বিষয়ে স্থায়ী রাখিবার ক্ষমতা সমান নহে (১০ পৃষ্ঠা দেখুন)। সেইজন্য বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠের সময় নির্দ্ধারিত করা উচিত। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ ৩০ মিনিটে পিরিয়ড্ চলিতে পারে। যে সকল

পাঠ্য-বিষয়ে মানসিক শক্তি অধিক আবশ্যক হয়, যেমন—গণিত, সাহিত্য ইত্যাদি, সেই সকল বিষয় দিনের প্রথমভাগে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য ; বিশ্রামের পরেও দেওয়া চলিতে পারে। কারণ, তখন শিশুদিগের মানসিক শক্তি সতেজ থাকে। অধিক মানসিক শ্রম আবশ্যক—এরূপ বিষয় পর পর শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। যে সকল বিষয়ে মানসিক শ্রম অল্প প্রয়োজন—যেমন ড্রইং, হস্তাক্ষর ইত্যাদি, তাহা দিনের শেষভাগে দেওয়া উচিত। কারণ দিনের শেষের দিকে ছাত্রদিগের মানসিক শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি তাহা বোর্ডিং স্কুল না হয়, তাহা হইলে প্রথম ঘণ্টায় কোন কঠিন বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, কারণ ছাত্রগণ দূর হইতে আসে এবং সেকারণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। একটি কঠিন বিষয়ের পর একটি সহজ বা কার্য্যকর বিষয়—যেমন সঙ্গীত, সেলাই, বস্তুপাঠ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া উচিত। দৈনিক কাজের প্রথমভাগে বা খেলার ছুটির পর হস্তলিপি, ড্রইং ইত্যাদি দেওয়া উচিত নহে, কারণ শারীরিক পরিশ্রমের পর অঙ্গুলি সহজে কার্য্যকর হয় না। নিকটবর্ত্তী কয়েকটি শ্রেণীতে যাহাতে একই সময়ে মৌখিক পাঠদান কার্য্য না চলে, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে, কারণ তাহাতে গোলযোগ হয়। প্রত্যেক বিষয় নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ সপ্তাহে যে দিন যে বিষয়ে পাঠ দেওয়া হইল, পরের সপ্তাহে সেই দিনই সেই বিষয়ে পাঠ দেওয়া উচিত।

কি কি উপায়ে একই শিক্ষক দুই বা ততোধিক শ্রেণীতে পাঠ দিতে পারেন? প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা কম। একারণ প্রতি শিক্ষকের প্রায়ই দুই বা ততোধিক শ্রেণীর শিক্ষা একসঙ্গে গ্রহণ করিতে হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে তাহা সম্ভব হইতে পারে; যথাঃ—(১) একাধিক শ্রেণীতে এক সময়ে অঙ্ক শিক্ষা দান করা যায়। পৃথক কালবোর্ড থাকিলেই হইবে। (২) এক শ্রেণীতে পঠন ও অপর দুই শ্রেণীতে কালবোর্ডের সাহায্যে রচনা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কয়েকটি শব্দ দিয়া বাক্য রচনা বা কোন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিতে আদেশ দিয়া অপর শ্রেণীতে পড়ান চলিতে পারে। (৩) এক শ্রেণীতে লিখন ও অপর শ্রেণীতে ইতিহাস বা ভূগোল শিক্ষা দেওয়া যায়। (৪) ড্রইং-এর সহিত অন্য শ্রেণীতে সাহিত্য, ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায়। (৫) বস্তুপাঠ, হাতের কাজ, গল্প প্রভৃতি এক সময়ে একাধিক শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া চলে।

সময়-পত্রের উপকারিতা—কখন কি পাঠ দিতে হইবে, তাহা প্রত্যহ ভাবিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে। সময়-পত্রের দ্বারা বালকগণ সময়নিষ্ঠ ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে পারে।

লাইব্রেরী বা পাঠাগার

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠাগার থাকা উচিত। ইহাতে সকল শ্রেণীর শিশুদিগের উপযোগী "শিশু-পাঠ্য" পুস্তক সকল রাখিতে

হইবে। লাইব্রেরীতে নির্ব্বাচিত পাঠ্য-পুস্তকসকল ব্যতীত এমন সব পুস্তক থাকিবে, যাহা পাঠ করিয়া শিশুরা আমোদ ও আনন্দ লাভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। পাঠাগারের জন্য চিত্তাকর্ষক চিত্র সম্বলিত, সুরুচি-সম্পন্ন পুস্তক ক্রয় করা কর্ত্তব্য। পাঠ প্রস্তুত করিবার পক্ষে সাহায্যকারী পুস্তকসকল শিক্ষকগণের জন্য ক্রয় করিতে হইবে। লাইব্রেরীর চতুর্দ্দিকে বড় বড় মনীষীদিগের উপদেশ-বাণী এবং তৎসহ তাঁহাদের চিত্রাবলী টাঙ্গাইয়া রাখা উচিত। নীরব পঠনের জন্য প্রত্যহ কিছু সময় রাখা কর্ত্তব্য এবং ছাত্রদিগকে বাড়ীতে পড়িবার জন্য পুস্তক দিতে হইবে। এই সমস্ত পুস্তক পাঠ করিবার পর শিক্ষকগণ সেই বিষয়ে মোটামুটি প্রশ্ন ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। লাইব্রেরী হইতে ছাত্রগণ যাহাতে তাহাদের নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী পুস্তক লইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত, কোন প্রকারেই ছাত্রদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করা চলিবে না।

কার্য্যের পরিকল্পনা
(Scheme of Work)

প্রধান শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে কতখানি কার্য্য কত দিনে করিতে হইবে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিবেন। মনে করুন, কোন শিক্ষক চতুর্থ বা তৃতীয়

শ্রেণীতে সাহিত্য পাঠ দিবেন। প্রতি মাসে কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থান পর্য্যন্ত পড়াইবেন, তাহার তালিকা প্রস্তুত রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক পদ্ধতি থাকিবে। সেই পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁহাকে পাঠদান করিতে হইবে এবং কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম হইলে সে বিষয়ে মন্তব্যসহ কৈফিয়ৎ প্রধান শিক্ষককে দিতে হইবে। এইভাবে কার্য্য করিলে সময় সম্বন্ধে দায়িত্ব জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ে পুনরালোচনার সুযোগ লাভ করা যায়।

বিদ্যালয়ের খাতাপত্র

বিদ্যালয়ের খাতাপত্রাদি বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত এবং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহার। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত খাতাপত্রাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঃ—

(১) ছাত্রদের ভর্ত্তির বহি, (২) ছাত্র ও শিক্ষকগণের দৈনিক হাজিরা বহি, (৩) ছাত্র-বেতন আদায়ের বহি, (৪) শিক্ষকদিগের বেতন প্রাপ্তির রসিদ বহি, (৫) দৈনিক জমা-খরচের বহি, (৬) বাজে খরচের হিসাব বহি, (৭) লাইব্রেরীর জমা খরচ, (৮) পুরস্কার বিতরণের হিসাব বহি, (৯) চাঁদা আদায়ের বহি, (১০) পরীক্ষার ফলের বহি, (১১) কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্যের বহি, (১২) প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের ফাইল, (১৩) প্রদত্ত সার্টিফিকেটের নকল, (১৪) প্রাপ্ত চিঠির ফাইল,

(১৫) প্রধান শিক্ষকের আদেশ বহি, (১৬) সম্পাদকের আদেশ বহি, (১৭) বৃত্তি-প্রাপ্তির রসিদ বহি, (১৮) বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রের লিষ্ট, (১৯) লাইব্রেরী-পুস্তকের লিষ্ট, (২০) ছাত্রদের পুস্তক ধার দিবার হিসাব, (২১) শাস্তিদানের বহি, (২২) পরিদর্শন বহি, (২৩) ছাত্রদিগের আচরণের বহি, (২৪) প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ড থাকিলে তাহার হিসাব বহি ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের খাতাপত্রাদি নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলতার সহিত রক্ষিত হওয়া উচিত এবং প্রত্যেক খাতাই সকল সময়ে পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য

বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সকল সময়েই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রেণীগুলি অপরিষ্কৃত অবস্থায় না থাকে, দেওয়ালে বা মেঝেতে থুথু বা গয়ের না থাকে, প্রস্রাব করিবার ও পায়খানায় যাইবার ঘর নিয়মিত ফিনাইল দিয়া যাহাতে ধৌত হয়, জঙ্গল বা আগাছা এবং জল জমিয়া যাহাতে মশক জন্মিতে না পারে,—সেই সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বে যাহাতে পাট পচাইবার পুকুর, এঁদো ডোবা অথবা দুর্গন্ধময় নালা ইত্যাদি না থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বোর্ডিং থাকিলে ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

খেলাধূলা

শারীরিক উন্নতি বিধান শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ। খেলাধূলার ভিতর দিয়া আমরা ছাত্রদের প্রবৃত্তিগুলিকে কাজে লাগাইতে পারি। খেলাধূলার মধ্য দিয়া ছাত্রদের ভিতর প্রতিযোগিতার ভাব আনয়ন করা যায়—নিয়মানুবর্ত্তিতা, শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতার অনুশীলন করা যায়।

"সকল সময় লেখাপড়া করায় এবং খেলাধূলা না করায় জ্যাক্ নির্ব্বোধ, স্ফূর্ত্তিহীন বালকে পরিণত হইয়াছে"—ইংরাজীর এই প্রবাদ বাক্য অত্যন্ত সত্য। কেবলমাত্র লেখাপড়ার চর্চ্চার দ্বারা শিশুদিগকে 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না, সেইসঙ্গে শারীরিক উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

খেলাধূলার জন্য আমরা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস্ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারি, কিন্তু এইগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এগুলির স্থলে হাডুডু, কপাটী প্রভৃতি দেশী খেলার প্রবর্ত্তন করিতে পারি। ইহা ব্যতীত ব্রতীবালক (Scout), মেয়েদের জন্য গার্ল-গাইড্ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। 'ব্রতচারী' প্রবর্ত্তনের দ্বারা অনেক বিদ্যালয়ে প্রচুর উপকার পাওয়া গিয়াছে। ইহা অল্প ব্যয়সাধ্য এবং সম্পূর্ণ দেশী প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষক মহাশয়দিগকে ছাত্রদের খেলাধূলা বিষয়ে সকল সময় সচেতন থাকিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে হইবে। খেলার সময় খেলার মাঠে শিক্ষকদিগের উপস্থিতি

ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনাই সৃষ্টি করে। ছাত্রগণ খেলাধূলার মধ্য দিয়া সমস্ত বিদ্যালয়ের সুনামের জন্য চেষ্টিত হয়। ইহা অত্যন্ত মঙ্গলজনক।

শিক্ষাদান প্রণালী

উত্তম পাঠের লক্ষণ

শিক্ষক ছাত্রের পথ-প্রদর্শক। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হইবে—নিজেই শুধু পথ অতিক্রম করা নহে—ছাত্রকে সঙ্গে লইতে হইবে, নচেৎ অধ্যাপনার উদ্দেশ্য বিফল হইবে। শিক্ষকের যত্ন ও আগ্রহের সহিত শিশুকেও আগ্রহ ও যত্নশীল হইতে হইবে। ইহার জন্য শিক্ষককে ছাত্রের মনে নূতন বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহলের উদ্রেক করিতে হইবে। শিশুর মনে যদি জানিবার জন্য আগ্রহ ও ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে শিক্ষাদান কার্য্য সম্ভব হইবে না। ছাত্র যতই নিজের চেষ্টায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে চেষ্টিত হয়, শিক্ষাদান কার্য্য ততই সহজ ও সুষ্ঠু হইয়া উঠিবে। কৌতূহল, ইচ্ছা ও আগ্রহের উদ্রেক করিতে হইলে শিক্ষককে উত্তমরূপে পাঠ দিতে হইবে। উত্তম পাঠের কি কি নিদর্শন ঃ—

(১) পাঠ উদ্দেশ্যপূর্ণ হইবে—উদ্দেশ্যহীন পাঠ শিশুর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা চাই। যাহারা শিখিবে, তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত না

হইলে উদ্দেশ্য যতই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, কোন ফল লাভ হইবে না।

(২) সময় ও শক্তির অপচয় হইতে দেওয়া উচিত নহে। ঠিক উপযুক্ত স্থানে পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে। ছাত্রের জ্ঞাত বিষয় যদি পুনরায় আরম্ভ করা হয়, তাহাতে সময় ও শক্তি উভয়ই বৃথা ব্যয় হয়। একারণ ছাত্রের পূর্ব্বজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষকের ধারণা থাকা উচিত এবং সেইমত আরম্ভ করিতে হইবে।

(৩) পাঠের সূচনায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াই পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রস্তুতি করণের জন্য অধিক সময় দেওয়া উচিত নহে।

(৪) পাঠের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন সোপান বা শাখার অবতারণা করিতে হইবে।

(৫) যে পাঠে ছাত্র নূতন কিছু না শিখিতে পারিল, সে পাঠ নিরর্থক। পাঠান্তে এবং পাঠের প্রত্যেক সোপানে প্রশ্ন দ্বারা ছাত্রদের জ্ঞান-বৃদ্ধি বিষয়ে জানিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

জগতের যে কোন উন্নত জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই উন্নতির মূলে আছে—শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষ অন্ধের ন্যায়। জনগণকে

শিক্ষা দান করিতে হইবে—ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা জাতিকে—তথা দেশকে উন্নত করিতে হইবে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এ বিষয়ে একমত। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক দ্বারা দেশ উপকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারাই দেশ নহে—দেশ বলিতে জনসাধারকে বুঝিতে হইবে। অতএব এই জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা সম্ভবপর—একমাত্র ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দ্বারা।

"বাঙ্গলাদেশ যাহা অগ্ন চিন্তা করে—ভারত তাহাই আগামীকল্য চিন্তা করে।"—এক সময় এই বাক্যের সার্থকতা ছিল—কিন্তু আজ ঠিক তাহার বিপরীত। আজ বাঙ্গলা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলার জনগণ পানীয় জলের পুষ্করিণীতে পাট পচাইতেছে, তাহাদের বাড়ীর যেখানে-সেখানে আবর্জ্জনা স্তূপাকারে রহিয়াছে—প্রচুর জঙ্গল ও আগাছা বাড়ীর চতুর্দ্দিকে। চাষী-প্রধান দেশ, কিন্তু চাষের কোন খবর রাখে না। চাষ করিবার জন্য কোন্ ফসলে কি সার প্রয়োজন, তাহার ধার ধারে না। বাজারের চল্‌তি দরের সংবাদ রাখে না, কাজেই যে কোন মূল্যেই "ফড়িয়া"দের নিকট জিনিষ বিক্রয় করিয়া দেয়। এই অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। যতক্ষণ দেশের এই অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়া জ্ঞানলাভ না করিতেছে, ততক্ষণ মঙ্গল নাই। এই প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পল্লীর চাহিদা অনুযায়ী—পল্লীর

প্রয়োজনকে ভিত্তি করিয়া (Rural bias) প্রদান করিতে হইবে। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যেরূপ দায়িত্ব আছে—জনসাধারণের দায়িত্ব তাহা অপেক্ষা কম নহে। তাহাদিগকেও যত্নবান্ হইতে হইবে এবং তাঁহাদের আগ্রহের মধ্য দিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়

ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে ১ম শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক, এমন কি বাকি তিন শ্রেণীর ছাত্রসমষ্টি হইতেও অধিক। ইহার মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। ১ম শ্রেণীর ছাত্রের ৯ ভাগের এক ভাগও অনেক সময় থাকে না। ইহাই অপচয়—চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অর্থের বিরাট অপচয়। যে সকল ছাত্র পড়াশুনা ত্যাগ করিল তাহাদের পিছনে যে অর্থ, পরিশ্রম ও সময় ব্যয়িত হইল, তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইল। এইরূপও দেখা যায় যে অনেক ছাত্র ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছে তাহাদেরও জ্ঞান যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ইহাও কি এক প্রকারের অপচয় নহে ?

অপচয় নিবারণের উপায়

১। **বাধ্যতামূলক শিক্ষা**—যাহা ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। ইহাতে ছাত্র আরও অধিক সময় স্কুলে থাকিতে পারিবে, এবং তাহার জ্ঞানও দৃঢ় হইবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা ব্যতিরেকে প্রাথমিক শিক্ষার অপচয় দূর করা যাইবে না।

২। **বয়স্কদের শিক্ষা**—সাধারণতঃ দেখা যায় যে যে সকল ছাত্রের অভিভাবক লেখাপড়া জানে না, তাহারাই লেখাপড়া শিখিতে চাহে না। বয়স্কদিগকে যদি লেখাপড়া শিখান যায় তবে তাহারা লেখাপড়া বিষয়ে সচেতন হইবে এবং তাহাদের শিশুরা যাহাতে লেখাপড়া শিক্ষা করে সে বিষয়ে সচেতন হইবে।

পরীক্ষা

শিক্ষার ফলাফল বিচারের জন্য পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা কতদূর কার্য্যকরী হইল, তাহা জানা প্রয়োজন। বর্ত্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। যথা—

১। ইহাতে প্রকৃত জ্ঞান বিচার করা হয় না। পরীক্ষা পাশের জন্য মুখস্থের উপর ছাত্রদের বেশী ঝোঁক থাকে।

২। পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্যই শিক্ষক অধিক মনোযোগী হন।

৩। পরীক্ষার অত্যধিক চাপে অনেক সময় ছাত্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

এই আপত্তিগুলি অল্প চেষ্টা করিলে দূর করা যায়।

১। পরীক্ষার নিয়মাবলী সুনিয়ন্ত্রিত হইলে অনেকাংশে উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

২। বিদ্যালয়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্য হইবে শিক্ষাদান ও উৎসাহ বর্দ্ধন। শিক্ষকের দিক হইতেও পরীক্ষা গ্রহণ করাও প্রয়োজনীয়তা আছে। কি ভাবে শিক্ষা দিতেছেন তাহার ফলাফল তাঁহার পক্ষেও জানা প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট

বর্ণ-শিক্ষাদান প্রণালী

অক্ষর উচ্চারণের ধারা—অক্ষরগুলির উচ্চারণ শিক্ষায় তিনটি ধারা অবলম্বিত হইয়া থাকে। যথা—(১) বর্ণের ধারা, (২) ধ্বনির ধারা (Phonetic), (৩) শব্দের ধারা।

(১) **বর্ণের ধারা**—প্রথমে শৃঙ্খলাক্রমে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণমালার সাধারণ উচ্চারণ শিক্ষা দিয়া, পরে তাহার

দ্বারা শব্দ-নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়াকে বর্ণের ধারা বলে। এই প্রণালীই ভাষা শিক্ষা দানের প্রারম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে—বিশেষ অন্যান্য প্রণালী অপেক্ষা ইহা সহজ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যায় যে, এই প্রণালীতে বর্ণগুলির প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা যখন ক, খ প্রভৃতির উচ্চারণ শিক্ষা দান করি, তখন প্রকৃত ক, খ উচ্চারণ না করিয়া স্বরযুক্ত (অ-যুক্ত) ক, খ উচ্চারণ করিয়া থাকি, যেমন—"বক" উচ্চারণ করিতে 'অ'-কার যুক্ত 'ব' উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু 'অ'-কার যুক্ত 'ক' উচ্চারণ করিলাম না—এই স্থানেই 'ক'য়ের প্রকৃত উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু 'ক' শিখাইবার সময় আমরা 'অ'-কার যুক্ত 'ক' শিক্ষা দিয়া থাকি।

(২) **ধ্বনির ধারা**—স্বরবর্ণের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের নিমিত্ত যে ধ্বনিমাত্র করা হয়, তাহাকে ধ্বনির ধারা বলে। 'ম' উচ্চারণ করিবার সময় আমরা প্রথমে ওষ্ঠ অধর সংলগ্ন করি; পরে 'ম'-এর অ-কার অংশ উচ্চারণের জন্য আবার ওষ্ঠদ্বয় বিভিন্ন করি। কিন্তু যদি 'ম' উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিয়াই আর ফাঁক না করি, তবেই 'ম'-এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়। 'আম' উচ্চারণ করিতে যে অ-কারশূন্য 'ম'-এর উচ্চারণ হয়, তাহাই 'ম'-এর প্রকৃত ধ্বনি। এই প্রথা বিজ্ঞানসম্মত হইলেও খুব শক্ত। এই প্রণালীর দোষ এই যে, ইহাতে শিশুদের তোত্‌লামি অভ্যাস হইতে পারে।

(৩) **শব্দের ধারা**—এই ধারাকে সাধারণতঃ 'দেখা-পড়া' ধারা বলে। শিশুরা প্রথমে শব্দ শিক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ অ, আ, ক, খ ইত্যাদি না পড়িয়াই নানা শব্দের সাহায্যে শিশুরা মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে—সেইজন্য বিশ্লেষণ প্রথানুসারে শব্দ ভাঙ্গিয়া বর্ণশিক্ষা দান করা উচিত, কারণ শব্দ আমাদের পরিচিত—বর্ণ অপরিচিত। এই উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হইবে—যথা বোর্ডের উপর, উত্তম অক্ষরে 'বক, বর, বল্, বন্' লিখিয়া দিলাম। এই সকল শব্দ শিশুদের পরিচিত। তৎপরে এক-একটি শব্দ দেখাইব ও উচ্চারণ করিব—শিশুগণ বোর্ডে লিখিত শব্দের প্রতি দৃষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে। এইরূপে শব্দের আকৃতিবোধ জন্মিবে—তখন বক, বন্, বর ও বল্ প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ পৃথক করিয়া, ধ্বনির ধারানুসারে, শিক্ষা দিতে হইবে। বর্ণের আকার ও উচ্চারণ একই সঙ্গে শিক্ষা হইবে।

বিশেষ উচ্চারণ ধারা—ইংরাজী বর্ণমালা অসম্পূর্ণ বলিয়া ইংরাজেরা একটি বিশেষ উচ্চারণের ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন—ইংরাজীর অনেক বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ এক, কিন্তু শব্দের সংযোগে তাহাদের বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন—cut, এখানে 'c'এর উচ্চারণ 'ক'; কিন্তু city, এখানে 'c'এর উচ্চারণ 'স'। কিন্তু বাংলা অক্ষরমালা এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য বাংলা বর্ণমালায় এ ধারায় কোন আবশ্যকতা নাই।

উচ্চারণ শিক্ষা—বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিতে হইবে। কেহ কেহ স্বরের অ, স্বরের আ, এইরূপ ভুল শিক্ষা দিয়া থাকেন। যে বর্ণকে অন্তস্থ অ (য়) বলা হয়, তাহার উচ্চারণ 'অ' নহে 'ইঁয়'।

---

1. Aim of teaching English

ইংরাজী শিক্ষার উদ্দেশ্য চারিটি :—

(ক) কথিত ইংরাজী বুঝিতে পারা, (খ) ইংরাজী বলিতে শিক্ষা, (গ) হাতে লেখা ও ছাপান ইংরাজী বুঝিতে পারা ও পড়িতে শিক্ষা, (ঘ) ইংরাজী লিখিতে শিক্ষা।

প্রত্যেক বালকের এই উদ্দেশ্যগুলি অনুসরণ করিতে হইবে। কারণ, ইহারা পরস্পর সংযুক্ত এবং পরস্পরের সহায়ক।

বাঙ্গলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা দ্বিবিধ ; যথা— ইহা কেবল শিক্ষা ব্যপদেশেই শিক্ষা করা হয় না, ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই ইহা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ দ্বিভাষাভাষী দেশ, ইংরাজী রাজভাষা শিক্ষা করা বিশেষ দরকার। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইংরাজী সব সময় ব্যবহার করিতে হয়, কাজেই ইংরাজী শিক্ষা করা বাঙ্গালী ছাত্রদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

2. Importance of commencing with oral words

ভাষা শিক্ষা দিতে হইলে প্রথমে মুখে মুখে শব্দ শিক্ষা দিতে হইবে ; কারণ লিখিতে ও পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কথা বলিতে শিক্ষা করা সহজ। আমরা শিশুকালে প্রথমে কথা বলিতে শিখি, পরে লিখিতে ও পড়িতে শিখি। সেইরূপ বিদেশী যে কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সকল জিনিষ, ব্যক্তি ও পদার্থ দেখিতে পাই, সেগুলি লইয়া আরম্ভ করা দরকার। চতুস্পার্শ্বস্থিত জিনিষপত্র ও আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি বিষয় জানিবার জন্য শিশু সকল সময় উৎসুক থাকে। সেইজন্য এই সকলের নাম সে শীঘ্রই আরম্ভ করিতে পারে। তৎপর মুখে মুখে সংখ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, তৎপর বিভিন্ন প্রকারের পবিমাণ শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপ মৌখিক শিক্ষা দিতে direct methodই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। এই method দ্বারা আমরা জিনিষ বা ব্যক্তি বিশেষের নাম শিক্ষা দিতে পারি। কোন নূতন শব্দ বা অভিব্যক্তি সোজাসুজি বালকের মনে সেই পদার্থের পরিবর্ত্তে উপস্থিত হয় অথবা জাগিয়া উঠে, মাতৃ-ভাষার মধ্য দিয়া আসে না। যথা—১। শিক্ষক একটি বালককে দাঁড় করাইবেন, ২। শিক্ষক বাক্যের আদর্শ দিবেন He is standing, ৩। শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন—What is

he doing ? ছাত্রের উত্তর—He is standing. এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই পদ্ধতি দ্বারা কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? সাধারণতঃ যে সকল শব্দের দ্বারা পদার্থ এবং জন্তু বুঝায়, সেইগুলি প্রথমতঃ শিক্ষা দিতে হইবে, কারণ সেইগুলি ছাত্রদের পরিচিত। বিদ্যালয়-গৃহের আসবাবপত্রাদি এবং শ্রেণীর মধ্যে সম্পাদিত কার্য্যাদি দ্বারা প্রথমে আরম্ভ করিলে ফল ভাল হইবে। ছবি, ফটো এবং জিনিষপত্র শিক্ষক ক্লাসে আনিবেন এবং তাহাদের সাহায্যে সোজাসুজি শিক্ষা দিবেন।

ইহার পরে বাক্য-গঠন শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া (drilling) নূতন শব্দ দৃঢ় করিতে হইবে। অনেক সময় ভুল ধারণা থাকে যে, direct methodএ মাতৃভাষা আদৌ ব্যবহার করা চলে না, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অনেক সময় কি করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য অথবা কোন সন্দেহজনক অবস্থা পরিষ্কার করিবার জন্য মাতৃভাষা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

3. Direct method

সুবিধা—

১। ইহা ছাত্রদের আগ্রহ উৎপাদন করে এবং এই আগ্রহ শিক্ষকের অর্দ্ধেক কাজ আগাইয়া দেয়। ইহা সকল

সময় ছাত্রদিগকে কর্ম্মতৎপর রাখে এবং তাহাদের এই সঙ্গে শারীরিক কষ্টও করিতে হয়, মাত্র পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। ২। ইহা শীঘ্র শীঘ্র ভাষা শিক্ষার পক্ষে উত্তম উপায়। ৩। ইংরাজী কথা ও ইংরাজী বলিতে বুঝিতে পারা—এই উভয় প্রকার দক্ষতা কেবলমাত্র অভ্যাস দ্বারা গঠিত ও বর্দ্ধিত হয়, Direct Method দ্বারা এই অভ্যাসের সুযোগ আমরা পাই।

অসুবিধা—

এই Methodএ কতগুলি অসুবিধাও আছে। এই পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষকের উদ্দেশ্যের মধ্যে দুইটি উদ্দেশ্য খুব সুন্দররূপে অগ্রসর হয়, ইংরাজীতে কথা বলিতে পারা ও ইংরাজী বলিলে বুঝিতে পারা। ইহা পরিস্ফুট যে, অবান্তর বা দুর্ব্বোধ্য ভাবসকল, যথা—honesty, love, hate প্রভৃতি—এই পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই পদ্ধতি ছাত্রদিগকে লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া, কিন্তু ইংরাজী শব্দ বুঝিয়া তাহা ভাষায় ব্যবহার করিতে জানিবার দরুণ পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে সাহায্য করে। Black-board হইতে পড়া ও উহা দেখিয়া লিখিতে শিক্ষা দেওয়া Direct Methodএ সম্ভবপর।

Reading—Direct Methodএ পাঠ-দানের সঙ্গে সঙ্গে Reading শিক্ষা দেওয়া যায়। যে সমস্ত শব্দ মুখে মুখে শিক্ষা করা হইয়াছে, যেমন—pen, book, table ইত্যাদি

শিক্ষক বোর্ডে লিখিবেন, তিনি প্রত্যেক শব্দটির উচ্চারণ নিজে করিবেন এবং ছাত্রদিগকে তাহা পড়িয়া উচ্চারণ করিতে বলিবেন। তৎপরে শব্দটির অক্ষরগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবেন এবং ছাত্রগণ বানান করিতে শিক্ষা করিবে। এইরূপ শব্দগুলি পড়িয়া উচ্চারণ করিতে ও বানান আয়ত্ত করিতে শিখিলে যে সকল বাক্য মুখে মুখে শিক্ষা করা হইয়াছে, সেইগুলি বোর্ডে লিখিতে হইবে এবং পূর্ব্বের পদ্ধতি অনুযায়ী ছাত্রগণ শিক্ষকের পড়িবার পর নিজেরা পাঠ করিবে। মাঝে মাঝে শিক্ষক বোর্ডে না লিখিয়া ছাত্রদের দ্বারা তাহাদের পরিচিত শব্দ ও বাক্য বোর্ডে লেখাইবেন।

Writing—Reading অভ্যস্ত হইবার পর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা writingএও অভ্যস্ত হইবে। এইভাবে একই সঙ্গে পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। বোর্ডে লিখিবার সময় শিক্ষকমহাশয়কে সকল সময় মুদ্রাক্ষরের অনুরূপ অক্ষর (script) ব্যবহার করিতে হইবে, চল্‌তি হাতের লেখার হরফ ছাপান হরফ হইতে অনেক পৃথক হয় এবং চল্‌তি হাতের লেখা পড়িতে শিখিলেই অনেক সময় ছাপান অক্ষর পড়া যায় না। শিশুদিগকে এই সময় যদি ছাপার অক্ষরের ন্যায় অক্ষর দ্বারা লেখা আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে পড়িতে শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইবে। মুদ্রাক্ষরের অনুরূপ বা হস্তলিপির সহিত ছাপার হরফের সাদৃশ্য থাকার দরুণ ছাপান পুস্তক পাঠ করিতে যথেষ্ট সাহায্য হয়। বোড

দেখিয়া ভাল করিয়া পড়িতে শিক্ষা করার পর ছাত্রদিগকে ছাপান প্রাইমার পড়িতে দিতে হইবে। এই সকল পুস্তক সহজ শব্দ ও সহজ বাক্য দ্বারা রচিত হইবে। এই সকল শব্দের অর্থ যদি তাহারা Drill Method দ্বারা শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সময় তাহাদের পড়িবার শ্রম অনেক কম হইবে।

Plan—

১। প্রথমতঃ বিষয়টির পূর্ব্বাভাষ (Subject Matter) —এই সময়ে পাঠের মধ্যে অবস্থিত শক্ত শক্ত শব্দগুলির অর্থ বলিয়া দেওয়া চলে, কিন্তু অনেকেই এই মতের বিরোধী। তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে শক্ত শক্ত শব্দগুলির অর্থ বলিয়া দিবার পক্ষপাতী নহেন। সেই গল্পটির মধ্যে যদি কোন ছবি থাকে, সেই ছবির বিষয় কিছু প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

২। শিক্ষকের দ্বারা আদর্শ পাঠ-দান কালে ছাত্রগণ তাহাদের পুস্তক অনুকরণ করিবে (Drill Work)।

৩। জটিল স্থানের ব্যাখ্যা ও জটিল উচ্চারণগুলি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করাইতে হইবে।

৪। ছাত্রদের একসঙ্গে পঠন।

৫। ব্যক্তিগত পঠন।

৬। পাঠটির উপর ভিত্তি করিয়া মৌখিক আলোচনার ভিতর প্রশ্ন ও উত্তর সংক্ষিপ্তকরণ। শব্দ ও বাক্য রচনা, (phrase) সরব ওনীরব পঠন।

নীরবে কি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে হইবে ; এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। যেখানে যেরূপ সুবিধা, সেইখানে সেইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

ঊর্দ্ধস্বরে পড়িলে ছাত্রদের ইংরাজী শব্দগুলি পরিষ্কাররূপে শুনিবার পক্ষে সাহায্য করিবে, কিন্তু নীরব-পঠন পাঠটির অর্থ শীঘ্র বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করে। নীরব-পঠন কালে শ্রেণী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকিবে, কোন প্রকার গুন্ গুন্ শব্দ হইবে না। নীরব-পঠনের পর শিশুদিগকে তাহাদের যে সকল শব্দ বা বাক্য বোধগম্য হয় নাই, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিতে হইবে। তৎপর তাহারা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা, অথবা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতে হইবে। ইহা সকল সময় মনে রাখিতে হইবে যে, কোন বাঁধাধরা নিয়ম সকল সময় প্রযোজ্য নহে।

Writing—প্রথম লিখিতে আরম্ভ করার সময়ে Direct Methodএ আরম্ভ করা উচিত। শিক্ষক ব্ল্যাক্-বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। ছাত্রগণ তাহা দেখিয়া তাহাদের খাতায় double line-এর ভিতর তাহা লিখিবে। Black-board দেখিয়া লিখিবার পক্ষে একটি বড় সুবিধা এই যে, ঠিক কিভাবে কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া অক্ষরগুলি লিখিতে আরম্ভ করা হয়, তাহা ছাত্রগণ দেখিবার সুযোগ পায় এবং যে উপায়ে লিখিত হয়, সেই উপায় অনুকরণ করিতে সুযোগ পায়। Black-board দেখিয়া লেখা মৌখিক ও পঠিত বিষয়কে সাহায্য করে। প্রথমেই Script

writing দিয়া লেখা আরম্ভ করা উচিত। এইরূপ লেখার পক্ষে দুইটি সুবিধা আছে—১। Script writing পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট। ২। ইহা অক্ষরগুলির প্রকৃত ও সহজ আকৃতি; ইহাতে কোনরূপ অতিরিক্ত সাজ-সরঞ্জাম থাকে না; তাহাতে লিখিবার পক্ষে খুব সুবিধা হয়। হাতের লেখা ও ছাপান অক্ষরের মধ্যে কোনরূপ তফাৎ থাকে না। ইহাতে লেখা দ্বারা পড়া ও পড়া দ্বারা লেখার সাহায্য হয়।

Copy Book—এমন অনেক Copy Book আছে, যাহা অর্থহীন শব্দ ও রেখা দ্বারা আরম্ভ হয়; ইহা ছাত্রদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। আবার এমন কতকগুলি Copy Book আছে, যাহা এইরূপ শব্দ ও বাক্য দ্বারা রচিত হয় যে, মৌখিক এবং পঠিত বিষয়ের সঙ্গে কোন মিল থাকে না। Copy Book ব্যবহার করিলে শিক্ষকের চেষ্টা Copy Bookএর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, সেজন্য Copy Book দেখিয়া লেখার অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে এবং সকল প্রকারের হাতের লেখা যাহাতে ভাল হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। Copy Book দেখিয়া লিখিলে কেবল Copy Book লেখার প্রতিই যত্ন দেওয়া হয়, অন্য প্রকার লেখার প্রতি অবহেলা করা হয়; তবে কয়েক প্রকারের অতি আধুনিক Copy Book ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছোট ছোট ছাত্রদের note লিখিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে তাড়াতাড়ি লেখার দরুণ তাহাদের হাতের লেখা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লেখার সময়—হাতের লেখার period খুব লম্বা হইবে না, কারণ ছাত্রগণ শীঘ্রই লিখিতে লিখিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সপ্তাহে ২।১ period হাতের লেখার জন্য প্রচুর নহে, প্রত্যহ বা একদিন অন্তর ৫ হইতে ২০ মিনিট সময় পর্য্যন্ত লেখানই প্রশস্ত। শ্রেণীতে লেখার অভ্যাস করিবার সময় শিক্ষক দেখিবেন, ছাত্রদের মধ্যে ঠিকমত লেখার অভ্যাস গঠিত হইতেছে কিনা। বসিবার ভঙ্গি ঠিক হওয়া চাই, বসিবার সময় ছাত্রের পা মেঝের সঙ্গে সংলগ্ন থাকিবে, উরুদুইটি মাটির সহিত সমান্তরালভাবে থাকিবে। লিখিবার সময় অঙ্গুলি ও বাহুর মাংসপেশীসমূহের পরিচালনা দরকার হয়, শুধু অঙ্গুলি দ্বারা কলম ধরিয়াও ভাল হাতের লেখা অভ্যাস করা যায়। কিন্তু অঙ্গুলির মাংসপেশীসমূহ বাহুর মাংসপেশীসমূহের ন্যায় সবল নহে, এ কারণ শীঘ্র শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বাহুর সাহায্য গ্রহণ করা উচিত, কারণ তাহা হইলে উঁচু ও নীচু টান দিবার সময় ক্লান্তি আসিবে না। কেহ কেহ বলেন, হেলান লেখা স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর, কারণ হেলানভাবে লিখিবার সময় শরীর ও পা বাঁকা করিবার ইচ্ছা হয় এবং কাগজও বাঁকাভাবে ধরিতে হয়, তাহাতে দৃষ্টি সোজা থাকে না।

হস্তলিপির উদ্দেশ্য—সুন্দর করিয়া তাড়াতাড়ি লেখার অভ্যাস গঠন করা।

বানান শিক্ষা—Incidental Method. 2. Drill Method.

Incidentalএ বানান শিক্ষা করিতে কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না এবং শব্দসকল পূর্ব্বাহ্নে মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় না। পড়িবার সময়ে অথবা অন্য সময়ে শিক্ষক ছাত্রদের মনোযোগ বানানের বিশুদ্ধতার প্রতি আকৃষ্ট করেন। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, ইহা পড়া এবং লেখার সহিত সংশ্লিষ্ট (co-related) এবং ইহাতে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিবার জন্য যে বিরক্তির ভাব আসে, তাহা আসে না। Incidental Method ভাল, কিন্তু ইহা দ্বারা বানান শিক্ষা বিষয়ে অধিক অগ্রসর হওয়া যায় না। আবার এই পদ্ধতিতেও কতকাংশে drilling দরকার হয়, কিন্তু drilling method দ্বারা অক্ষরগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষ পরিষ্কার হইয়া ছাত্রদের মনে ফুটিয়া উঠে। Spelling প্রধানতঃ (১) দৃষ্টিদ্বারা, (২) উচ্চারণ দ্বারা, (৩) অঙ্গভঙ্গি দ্বারা আয়ত্ত করা যায়।

ইহাদের মধ্যে দৃষ্টি দ্বারা বানান শিক্ষা দ্রুত হয়। কোন শব্দের বানান শিক্ষা দিবার সময় শিক্ষক সেই শব্দটি বোর্ডে লিখিয়া দিবেন। তৎপর অক্ষরগুলির পরস্পর সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি দিতে বলিবেন, পরে ছাত্রগণ সেই শব্দটি লিখিবে, শিক্ষক সেই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া বানান করিবেন।

Grammar---খ্যাতনামা লেখক ও বক্তাদের ভাষা ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়া Grammarএর উৎপত্তি। প্রথমে ভাষা, পরে Grammar. ইংরাজী ভাষার শিক্ষকদিগের মধ্যে Grammarএর কতখানি শিক্ষা দিতে হইবে, সে বিষয়ে

মতদ্বৈধ আছে। ইংরাজী শিক্ষার উদ্দেশ্য চারিটি ; যথা—(১) কথিত ইংরাজী বুঝিতে পারা, (২) বলিতে পারা, (৩) পড়িতে পারা, (৪) লিখিতে পারা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, Grammarএর যে অংশ বা যতটুকু এই লক্ষ্যগুলি পূর্ণ করিতে সাহায্য করে, ততটুকু শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য ; যাহা উক্ত উদ্দেশ্য-গুলিকে সাহায্য করে, ততটুকু শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহা উক্ত উদ্দেশ্যগুলিকে সাহায্য করে না, তাহা বাদ দিতে হইবে। Grammar ততক্ষণ উপকারী, যতক্ষণ ইহা ছাত্রদের উক্ত উদ্দেশ্য চারিটি লাভ করিতে সাহায্য করে। অতএব চল্‌তি Grammarএর অনেক অংশ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। Latin ও Greek ভাষা হইতে আমদানী বহু technical terms বাদ দেওয়া যায়, যেমন—Ablative case, Gerundial infinitive, এমন কি Gerund ও Verbal nounএর পার্থক্য শিক্ষা দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই ; এবং Gerundকেও বাদ দেওয়া যায়।

Grammarএর অবশ্য পাঠ্য—

Different parts of speech and their functions. The structure of sentence. ইহা দ্বারা idiomatic uses, sequence of tense, indirect speech and the particular preposition with particular words শিক্ষা দেওয়া হইবে। নীচের শ্রেণীতে readingএর composition lesson-এর সহিত grammar শিক্ষা দেওয়া হইবে।

যেমন একটি পাঠের পর বালকদের বস্তু বা ব্যক্তির নামের শব্দগুলি বাহির করিতে বলা হইবে। তখন যে যেগুলি noun ইহা বুঝাইতে হইবে। নিম্ন শ্রেণীতে মাতৃভাষার grammarএর উপর ভিত্তি করিয়া English grammar শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

Qualities of good readingএর প্রধান লক্ষ্য হইবে—

(১) Articulation—শব্দ এবং শব্দাংশগুলি পরিষ্কার করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, তাড়াতাড়ি করা হইবে না।

(২) Punctuationএর অর্থ বুঝিয়া মাঝে মাঝে উপযুক্ত-রূপে থামিতে হইবে, পূর্ব্বে এইরূপ ধারণা ছিল যে, সেখানে " , " আছে, সেখানে ১ গণিবার সময় পর্য্যন্ত থামিতে হইবে, যেখানে " ; " আছে, সেখানে এক—দুই গণিবার সময় পর্য্যন্ত থামিতে হইবে, কিন্তু এরূপ বাঁধাধরা কোন নিয়ম থাকা উচিত নহে। উপযুক্তরূপ থামিতে হইবে, তাহাতে অর্থ বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়।

(৩) Pronunciation—উচ্চারণ করিবার পদ্ধতি (phonetic) শিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) Loudness—পড়িবার সময় যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট ব্যতিরেকে শুনিতে পাওয়া যায়—এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে হইবে ; কিন্তু চীৎকার করিবে না।

Spoken English :—Special difficulties of Bengali children—

বাঙ্গালী শিশুদের ইংরাজী উচ্চারণের মধ্যে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়, যেমন—so-এর উচ্চারণ "ছো", কিন্তু do'র উচ্চারণ "ডু", কেন যে "ডো" হইবে না, তাহা বুঝাইয়া বলা শক্ত, কিন্তু ইংরেজ শিশুগণ শিশুকাল হইতে উহা উচ্চারণ শুনিতে শুনিতে অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং পড়িবার সময় সেইমত উচ্চারণ করে, তাহারা কোন অসুবিধা বোধ করে না। ইংরাজীতে "c" এই অক্ষরটি কখনও কখনও s-এর মত উচ্চারণ হয়; যেমন—place, এবং সময়ে সময়ে "k"-এর মত উচ্চারিত হয়, যথা—"cat" ক্যাট্।

—ough এই syllable অন্য syllableএর সহিত যুক্ত হইয়া ছয় প্রকারের বিভিন্ন উচ্চারণ সৃষ্টি করিয়া থাকে, যথা—plough, rough, cough, through, though, thorough. অতএব A B C D প্রভৃতি বর্ণগুলির যে উচ্চারণ আমরা সাধারণতঃ করিয়া থাকি, সেগুলি দ্বারা ভাষা উচ্চারণ করিতে কোন সাহায্য হয় না; ইহা ইংরাজী শিখিবার পক্ষে বিরাট বাধা; এই কারণে phoneticএর সৃষ্টি হইয়াছে। Phonetic একটি ভাষা উচ্চারণ বিষয়ক বিজ্ঞান, প্রত্যেক উচ্চারণ, তাহা যেভাবে উচ্চারণ করা হয়, তাহা সেইভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, যেমন—P এবং B ঠোঁট দ্বারা উচ্চারণ হয়, J এবং D জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা সম্মুখের দাঁতের গোড়ায় চাপ দেওয়া হয়, K এবং G জিহ্বার তলভাগ মুখগহ্বরের উপর চাপ দিয়া উচ্চারণ হয়। প্রত্যেক বিভিন্ন উচ্চারণের জন্য বিভিন্ন

phonetic symbol আছে। ঐগুলির বানানে অক্ষরের মিল না থাকিতেও পারে।

যখন সাধারণভাবে বানান শিক্ষা করিতে হইবেই, তখন আর phonetic methodএর বানান শিক্ষা করিয়া কি লাভ? ইহাতে ছাত্রদের দুইপ্রকার বানান শিক্ষা করিতে হয়। Phonetic methodএর বিপক্ষে যাহাই বলা হউক না কেন, প্রত্যেক ইংরেজ শিক্ষকের phoneticএর জ্ঞান থাকা দরকার। কথিত ইংরাজী প্রধানতঃ অনুকরণ দ্বারা শিক্ষা করা হয়। সেইজন্য ইহা বিশেষরূপে প্রয়োজন যে, শিক্ষকগণ ইংরাজী বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে শিখিবেন।

উচ্চারণে কতগুলি সাধারণ ভুল থাকে, যেমন—stamp (ইস্‌ট্যাম্প), spot (ইস্‌পট) ইত্যাদি। V এবং Wএর উচ্চারণের প্রভেদ মনে রাখিতে হইবে। ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে মনে রাখিতে হইবে যে, একটি ভাষার ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইলেই এই practical দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়।

Grammar—শিক্ষাদানকালে Inductive Method ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। প্রথমে অনেকগুলি উদাহরণ দিবার পর তাহা হইতে সংজ্ঞা বা Rule ঠিক করিতে হয়। এই-ভাবে সংজ্ঞা বা Rule ঠিক করিবার পর উহা Black-boardএ পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া ছাত্রদের দ্বারা পড়াইতে হইবে, তৎপর উক্ত সংজ্ঞা বা Rule অনুযায়ী ছাত্রদের নিজস্ব বাক্য রচনা করিতে বলা হইবে।

Composition—ছবি দ্বারা Composition শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমতঃ একটি ছবি লইয়া বোর্ডে টাঙ্গাইয়া তাহার অঙ্কিত বিষয় লইয়া ছোট ছোট প্রশ্ন দ্বারা ছাত্রদের নিকট হইতে উত্তর আদায় করিতে হইবে। এইরূপে সে ছবিটির বিষয়বস্তুর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর drill করাইতে হইবে এবং তৎপর ছবিটির বিষয়বস্তু লিখিতে বলা যাইতে পারে। প্রাইমারী স্কুলে এইরূপ picture compositionই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ইংরাজীর আদর্শ পাঠ

[Kindly permitted to publish by Mr. J. Lahiri, M. A., B. T., Dip. Ed. (London), M. R. S. T. (London), B. E. S.]

Long sound of the vowel 'a'
at the Baker's Shop.

Sound Drill:

ā	ā	ā	ā	ā	ā
ame	ame	ace	ate	age	ake
lame	tame	face	plate	cage	cake

ā	ā		Action words	
ame	ake		Bake	Put
name	bake		Give	Do

Sight word

Sad

Shop bit you

Now here

no (not)

Teacher
shows picture of a boy and an ape in a cage.

Question words

who	what
where	why

What is this ? This is an ape. Where is the ape ? The ape is in the cage. Is the

ape sad ? Yes, the ape is sad. Why is the ape sad ? He is lame. Is it a tame ape ? Yes, it is a tame ape. The tame ape is in the cage.

Teacher
shows picture of a boy at the baker's shop.

Who is this ? He is the baker. The baker is at his shop. It is the baker's shop. What does the baker do ? The baker bakes cake in his shop. Bake me a cake, Mr. Baker and put my name on it. My name is Abdul. Here is your cake. The baker puts the cake on a plate. Baker, give a bit of the cake to the ape. The baker gives the cake to the ape. The ape is not sad now.

Oral Drill

Where is the ape ?
Why is the ape sad ?
Is this a tame ape ?
What is the name of the boy ?
Who makes cakes ?
What does the baker do ?
Does he give the cake to the ape ?
Is the ape sad now ?

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনার মূল নিয়মগুলি এই—(১) সাত বৎসর কাল প্রাথমিক শিক্ষা সার্ব্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে; (২) শিক্ষাদান কার্য্য মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে; (৩) যে কোন একটা লাভজনক বৃত্তিমূলক কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে হইবে ঃ—

(১) মাতৃভাষা, (২) গণিত, (৩) সমাজ-বিজ্ঞান, (৪) বিজ্ঞান, যথা—প্রকৃতিপাঠ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, দৈহিক উন্নতি প্রভৃতি, (৫) অঙ্কন, (৬) সঙ্গীত, (৭) হিন্দুস্থানী ভাষা। বৃত্তিমূলক শিক্ষার মধ্যে ইহাদের যে কোন একটি, যথা—(১) সূতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন, (২) মিস্ত্রীর কাজ, (৩) কৃষি-বিজ্ঞান, (৪) ফল ও সব্‌জী উৎপাদন, (৫) চামড়ার কাজ, (৬) স্থানীয় প্রয়োজনানুসারে যে কোন একটি বৃত্তি। ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার দোষ-ত্রুটী—(১) ইংরাজী ব্যতিরেকে আমাদের চলা দুষ্কর, কারণ ভারতবর্ষ দোভাষী দেশ; (২) ছেলেদের পক্ষে জ্ঞানলাভের ইচ্ছার পরিবর্ত্তে 'বেনিয়া' প্রবৃত্তির

বিকাশ সাধিত হইবে; (৩) অপটু হাতে তৈয়ারী জিনিষ বাজারে উপযুক্ত দাম পাইবে না। ইহাতে ছাত্রদের পড়িবার খরচ সঙ্কুলান হইবার যে পরিকল্পনা আছে, তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

মন্তেসরী পদ্ধতি

ইটালী দেশের ডাঃ মন্তেসরী নাম্নী মহিলা এই পদ্ধতির প্রথম প্রচলন করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম 'মন্তেসরী পদ্ধতি'। ছাত্রগণ তাহাদের নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সম্ভব-মত শিক্ষালাভ করিবে—বাহিরের বাধাবিঘ্ন যতদূর সম্ভব কম আসিবে—ইহাই এই পদ্ধতির মূলনীতি। প্রথম হইতেই শিশুরা সহযোগিতামূলক ব্যবহার শিক্ষা করিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি সরঞ্জাম আছে। এইগুলির সাহায্যে শিশুরা নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করিবে। বাস্তব স্বাধীনতা শিক্ষা দিবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ছেলেদের কাজ দেখাশুনা করিবেন মাত্র (guide), বাধা দিবেন না—প্রয়োজনমত সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক শিশুর উন্নতি

সম্পর্কে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী ওয়াকিবহাল থাকিবেন এবং সুযোগ ও সুবিধা মত সাহায্য করিবেন, অথবা কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া উপদেশ দিবেন।

হার্বার্ট্ নীতি

জার্ম্মান শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট্ মনে করিতেন, জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত মনঃসংযোগ ও চিন্তন এই দুইটি মানসিক ক্রিয়ার সংঘটন ঘটে। মনঃসংযোগ দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় এবং চিন্তার সাহায্যে পূর্ব্ব জ্ঞানের সহযোগে নূতন জ্ঞান লাভ করি, মনঃসংযোগ দ্বারা বস্তুর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান হয় ও উহা হইতে পূর্ব্ব জ্ঞানের সদৃশ অংশের সহিত তুলনা আসিয়া পড়ে। তখন চিন্তন দ্বারা সাধারণ সূত্রে উপনীত হই এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উহাই প্রয়োগ করি। এইরূপ হার্বার্ট্ নীতিতে চারিটি সোপান আছে। যথা—

১। নূতন বিষয়ের উপলব্ধি।

২। পূর্ব্ব জ্ঞানের সহিত তুলনা।

৩। সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়া।

৪। সূত্রের প্রয়োগ।

পরবর্ত্তীকালে হার্বার্টের অনুবর্ত্তীগণ উপলব্ধিকে দুইটি সোপানে ভাগ করেন—প্রস্তুতি করণ ও প্রদান। এই ভাগে পঞ্চাঙ্ক-করণ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতির যাঁহারা সমালোচনা করেন তাহাদের মতে—

১। তুলনা হইতে সূত্রে উপনীত হওয়া যায় না।
২। পাঠে শিক্ষকের ও ছাত্রের কাজ কতটুকু তাহার নির্দ্দেশ নাই।
৩। যে মনোবিজ্ঞানের উপর ইহার ভিত্তি এক্ষণে অনেকে তাহা মানিতে প্রস্তুত নহেন।
৪। এই পদ্ধতির দ্বারা কেবলমাত্র অবরোহী প্রণালীর পাঠ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কথোপকথন পদ্ধতি
(Conversational Method)

এই পদ্ধতিতে অধ্যাপনা শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথাবার্ত্তার আকার ধারণ করে। শিক্ষক কোন বিষয়ের উত্থাপন করেন এবং যে বিষয়ে ছাত্রের সহিত সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা বলেন। ছাত্র কখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কখন বা শিক্ষকের প্রশ্নের

উত্তর করে। কথোপকথন নানা প্রকারের হইতে পারে, উহার মধ্যে **"সক্রেটীক"** পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

সেক্রেটীক পদ্ধতি তিনটি সোপানে বিভক্ত হইতে পারে—প্রথমতঃ শিক্ষক যেন কিছুই জানেন না; ছাত্রকে একটি বর্ণনা করিতে উৎসাহিত করেন। দ্বিতীয় সোপানে শিক্ষকেরা প্রশ্ন সাহায্যে ছাত্রকে এমন অবস্থায় উপস্থিত করেন যে সে তাহার পূর্ব্ব বর্ণনার বিপরীত সিদ্ধান্ত করে। তৃতীয় সোপানে শিক্ষক আরও কতকগুলি প্রশ্ন সাহায্যে ছাত্রকে প্রস্তাবিত বিষয়ের সঠিক জ্ঞানলাভে সমর্থ করেন। প্রথম সোপানে ছাত্রের বিশ্বাস থাকে যে তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য। দ্বিতীয় সোপানে তাহার সন্দেহের উদ্রেক হয়। তৃতীয় সোপানে তাহার সন্দেহ দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া হইল—

১ম সোপান—

শিক্ষক। শীতকালে অনেকে দুই হাতের তালু একত্র করিয়া তাহাতে ফুঁ দেয় কেন?

ছাত্র। হাত গরম করিবার জন্য।

শিক্ষক। হাত কিরূপে গরম হয়?

ছাত্র। মানুষের নিঃশ্বাস গরম কিনা, তাই ফুঁ দিলে সেই নিঃশ্বাসের সাহায্যে হাত গরম হয়।

শিক্ষক। তাহা হইলে নিঃশ্বাস গরম?

ছাত্র। হাঁ, তাতে আর সন্দেহ কি।